POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا
كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا
لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ○ (النساء:138)

নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে এবং অস্বীকারে তাহারা বাড়িয়া যায় আল্লাহ্‌ কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করিবেন না।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 4

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

28 জানুয়ারী, 2021 ● 14 জামাদিউস সানি 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

৯৫৫) হযরত বারাআ বিন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর নবী করীম (সা.) আমাদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দেন। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আমাদের নামাযের ন্যায় নামায পড়ল এবং আমাদের কুরবানীর ন্যায় কুরবানী করল, সে সঠিক কুরবানী দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানী করল, যেহেতু নামাযের পূর্বে কুরবানী হয়েছে, তাই সেটি কোন কুরবানী নয়। একথা শুনে হযরত আবু বারদা বিন নিয়াজ (রা.) যিনি হযরত বারাআ (বিন আযিব) এর মামা ছিলেন, তিনি বলেন: হে রসূলুল্লাহ্‌! আমি নামাযের পূর্বেই নিজের ছাগল জবেহ করে ফেলেছিলাম। আমি তো মনে করতাম, আজ খাওয়া-দাওয়ার দিন, তাই আমি চাইলাম, প্রথম যে ছাগলটি জবেহ হবে তা আমার ঘরেই হোক। এই কারণে আমি নিজের ছাগল জবেহ করে ফেলেছি আর নামাযে আসার পূর্বে প্রাতঃরাশ সেরেছি। আঁ হযরত (সা. বললেন, তোমার ছাগল তো মাংসের ছাগল। সে বলল: হে রসূলুল্লাহ! আমার কাছে এক বছরের একটি ছাগী আছে যা আমার কাছে দুটি ছাগলের থেকেও প্রিয়। সেটি কি আমার পক্ষ থেকে কুরবানী হিসেবে যথেষ্ট হবে? আঁ হযরত (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তোমার পর কারোর জন্য কুরবানী হিসেবে কাজে আসবে না।

(সহী বুখারী কিতাবুল ঈদাইন, ২য় খণ্ড, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত,১৮ ডিসেম্বর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি কর আর পশুসুলভ আচরণ ও মতবিরোধ পরিহার কর। সকল প্রকার হাসি-বিদ্রুপ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, হাসি-ঠাট্টা মানুষকে হৃদয় থেকে সত্যকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বার্তা

প্রকৃত বিষয় হল খোদা যা চান তা করেন। তিনি জনমানবশূন্য স্থানকে বসতিপূর্ণ স্থানে এবং সমৃদ্ধ বসতিকে জনমানবহীন বানিয়ে দিতে পারেন। বাবুল নগরীর কি পরিণতি হয়েছিল? যেখানে মানুষ বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিল, সেই স্থান পরিত্যক্ত ও জনমানবহীন হয়ে পড়ল, পেঁচার আড্ডায় পরিণত হল। অপরদিকে এমন স্থানও ছিল যেখানে মানুষ ধু-ধু প্রান্তর ছাড়া কিছু দেখতে চাইত না, সেই স্থানটিকেই আল্লাহ্‌ তা'লা এমন এক স্থানে পরিণত করলেন, যেখানে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হল। অতএব খুব ভাল করে স্মরণ রেখো যে, খোদা তা'লাকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবল ওষুধ এবং মানবীয় পরিকল্পনার উপর ভরসা করা ঘোর নির্বুদ্ধিতা। চায় এমন এক জীবন যা সম্পূর্ণ নতুন, যেখানে প্রচুর ইসতেগফার পাঠ করা হয়। যারা জাগতিকতায় খুব বেশি নিমজ্জিত, তাদের বেশি ভয় পাওয়া উচিত। চাকুরীজীবীরা প্রায়শই ফরয বা আবশ্যকীয় কর্ম পালন করতে ব্যর্থ হয়। অনেক সময় যোহর ও আসর এবং মগরিব ও এশা জমা করা সঙ্গত। আমি জানি, কর্মকর্তাকে নামাযের জন্য বলা হলে তারা অনুমতি দিয়ে দেন। আর উর্ধতন কর্তার অধীনে অফিসারদেরকে নির্দেশ দেওয়া থাকে। নামায এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এমন খোঁড়া অজুহাত দেখানো নিজের দুর্বলতা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। 'হুকুকুল্লাহ্‌ এবং হুকুকুল ইবাদ' পালনে ব্যর্থ হয়ো না।

এই সময় অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় পাওয়া উচিত। আল্লাহ্‌ তা'লা স্বীয় পুণ্যবান বান্দা ছাড়া আর কারো পরোয়া করেন না। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি কর আর পশুসুলভ আচরণ ও মতবিরোধ পরিহার কর। সকল প্রকার হাসি-বিদ্রুপ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, হাসি-ঠাট্টা মানুষকে হৃদয় থেকে সত্যকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপর নিজ ভাইয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ্‌ তা'লার সঙ্গে বিবাদ পরিহার কর এবং তাঁর আনুগত্যে ফিরে এস। আল্লাহ্‌ তা'লার শাস্তি পৃথিবীতে নেমে আসছে আর তার থেকে তারাই রক্ষা পাবে, যারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সমস্ত পাপ থেকে তওবা করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪১-২৪৩)

কাফেররা আশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল? একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের। তারাও একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদেরকে লাঞ্ছনা এবং পশ্চাদপদতা থেকে বের করবেন-আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে না যে আমাদের চিকিৎসা করবে।

কাফেররা আশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল! অধঃপতিত জাতির মধ্যে এই চেতনা কাজ করে যে তাদের মধ্যে কোনও বড় সত্তা সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ কাফেররা নিজেদের বিষয়ে এতটাই আশাহত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের চিকিৎসা যে তাদের মধ্যেই বিদ্যমান সেকথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাদের ধারণা ছিল, তাদের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির এবং চিকিৎসার জন্য বাইরে থেকে কারো আসা উচিত। একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের। তারাও একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদেরকে লাঞ্ছণা এবং পশ্চাদপদতা থেকে বের করবেন- আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে না যে আমাদের চিকিৎসা করবে। এবিষয়টিতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির সঙ্গে তাদের কিরূপ সামঞ্জস্য রয়েছে - সেই একই নিরাশা আর একই চিকিৎসার উপায়!

যারা জাতির উন্নতির জন্য হয় কোন উৎসাহ রাখতেন না, কিম্বা মনে করতেন, বাহ্যিক চিকিৎসা ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যখন তাদের মধ্য থেকেই তাদের ভাই দাবি করল, 'আমি তোমাদের চিকিৎসা করব আর তোমাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাব, তখন তাদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তারা আশ্চর্যচকিত ছিল যে, যে বিষয় সম্ভব ছিল না তা সম্ভব করার দাবি এ কিভাবে করল?

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তাদের জন্য আশ্চর্যের ছিল তা হল, এই দাবিদার দাবি করছে যে, তাকে মানুষকে সতর্ক করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কিছু পুরোনো কথা

(শেষাংশ ২ এর পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আপনাদের কাজ হল ইসলাম এবং আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বকে অবহিত করা। আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান ব্যাপক ও গভীর হওয়া এবং নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকা এবং ইসলামের শিক্ষা মেনে চলা আবশ্যক। যেমন- লজ্জাশীল পোশাক পরিধান করা, কোট এবং বোরকা পরার বয়সে উপনীত হলে বোরকা বা কোট ছাড়া বাড়ির বাইরে না যাওয়া, অশালীন বৈঠক, অনৈতিক বন্ধুত্ব এবং ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ইত্যাদি মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকা।

নাসেরাতদের বয়স হল শিক্ষার্জনের। নিজেদের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ যত্নবান হন এবং উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য পরিশ্রমের পাশাপাশি দোয়াও করুন।

প্রত্যেক জুমায় যখন আমার খুতবা সম্প্রচারিত হয় তখন সেটি শোনার ব্যবস্থা করুন। খুতবার বিশেষ বিশেষ অংশগুলি সঙ্গে সঙ্গে নোটও করতে থাকুন যাতে খুতবার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে।

নাসেরাতুল আহমদীয়ার জার্মানীর পক্ষ থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'গুলদাস্তা' প্রকাশ উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

লন্ডন
২০-০৩-২০১৭

স্নেহের নাসেরাতুল আহমদীয়া জার্মানী।
আস্‌সালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

একথা জেনে বড় আনন্দিত হলাম যে, আপনারা ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'গুলদাস্তা' প্রকাশ করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে সার্বিকভাবে বরকতমণ্ডিত করুন। আমীন।

এর জন্য মাননীয়া সদর লাজনা আমাকে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছেন। আমার বার্তা হল এই যে, অঙ্গ সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা খিলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণসমূহের মধ্যে এক অন্যতম মহান প্রাপ্তি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর প্রবর্তন করেছিলেন যাতে জামাতের প্রত্যেকটি শ্রেণীর মানুষ ধর্ম সেবার কাজে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং বিভিন্নভাবে নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে উন্নীত করার এবং ধর্মের প্রতি আকর্ষন সৃষ্টির সুযোগ পায়। লাজনা ইমাউল্লাহ্ অঙ্গ সংগঠনগুলির একটি, যার একটি শাখাকে নাসেরাতুল আহমদীয়া বলা হয়। এটি অনুর্ধ-১৫ আহমদী বালিকাদের একটি সংগঠন। অতএব খোদার কৃপায় আপনারা জামাতের সুদৃঢ় এবং সক্রিয় সংগাঠনিক তন্ত্রের অংশ যার কাজ হল ইসলাম এবং আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বকে অবহিত করা। এর জন্য আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান ব্যাপক ও গভীর হওয়া এবং নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকা এবং ইসলামের শিক্ষা মেনে চলা আবশ্যক। যেমন- লজ্জাশীল পোশাক পরিধান করা, কোট এবং বোরকা পরার বয়সে উপনীত হলে বোরকা বা কোট ছাড়া বাড়ির বাইরে না যাওয়া, অশালীন বৈঠক, অনৈতিক বন্ধুত্ব এবং ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ইত্যাদি মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিশতিয়ে নূহ পুস্তিকায় তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন যারা, অসৎ সঙ্গ এবং অশালীন বৈঠক যারা ত্যাগ করে না। অতএব এই শিক্ষাকে সব সময় স্মরণে রাখবেন। নাসেরাতদের বয়স হল শিক্ষার্জনের। নিজেদের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ যত্নবান হন এবং উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য পরিশ্রমের পাশাপাশি দোয়াও করুন। আপনারা নিজেদের কর্মসূচি এমনভাবে তৈরী করুন যেন তা থেকে ধর্মের প্রতি আপনাদের ভালবাসা প্রকাশ পায়। যেমন-প্রত্যেক জুমায় যখন আমার খুতবা সম্প্রচারিত হয় তখন সেটি শোনার ব্যবস্থা করুন। খুতবার বিশেষ বিশেষ অংশগুলি সঙ্গে সঙ্গে নোটও করতে থাকুন যাতে খুতবার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। যে কথা গুলি বুঝতে না পারেন বাড়িতে বড়দেরকে সেগুলি জিজ্ঞাসা করুন। এরফলে খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী হবে এবং ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে। চিন্তাধারা পবিত্র হবে এবং ধর্মের সেবা এবং জামাতী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন। স্মরণ রাখবেন! আপনারা নিজেদেরকে ধর্মের যত কাছাকাছি রাখবেন ততটাই সামাজিক কলুষতার হাত থেকে নিরাপদ থাকবেন। এরই মাধ্যমে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করবেন এবং তবলীগ করলে কথার মধ্যে প্রভাব থাকবে।

পত্রিকা ব্যবস্থাপনাকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক সংখ্যায় কিছু অংশ কুরআন শরীফ এবং হাদীস সংবলিত বিষয়াদি থাকা দরকার। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী থেকে উদ্ধৃতিও এতে প্রকাশ করুন এবং কয়েকটি পৃষ্ঠা আমার খুতবার জন্য সংরক্ষিত রাখুন। খুতবাগুলিকে প্রশ্নোত্তর আকারেও প্রকাশ করুন যাতে বাল্যকাল থেকেই আমাদের আহমদী বালিকারা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এর মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং গবেষণার প্রতি রুচি তৈরী করার জন্য দিক-নির্দেশনাও থাকা উচিত। নাসেরাতদের দিয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ এবং শিক্ষামূলক গল্প লেখানোর মাধ্যমে তাদেরকেও এই পত্রিকার অংশ করে তুলুন যাতে তারা অনুভব করে যে, এটি তাদের নিজেদের পত্রিকা এবং তারা এটি পড়তে বিশেষ আগ্রহী হয়। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

মির্যা মসরূর আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস

নিকাহর ঘোষণা

নামাযে জানাযার পর ২টা ১০ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) যোহর ও আসরের নামায পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া পাঠের পর খুতবা নিকাহর মাসনুন আয়াত পাঠ করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন এখন আমি কয়েকটি নিকাহর ঘোষণা করব। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মোট ১৬টি নিকাহর ঘোষণা করেন।

(১) হিবাতুল ওহীদ- পিতা মাননীয় মহম্মদ আহমদ সাহেব (পাকিস্তান)-এবং আদনান আহমদ মুরুব্বী সিলসিলা, ইসলামবাদ-পিতা নাসের আহমদ।

(২) রাগিবা যাহুর চৌধুরী, পিতা চৌধুরী যাহুরুল হক সাহেব (ফ্রান্স)-এবং চৌধুরী উসমা আহমদ মুরুব্বী সিলসিলা ফ্রান্স, পিতা- চৌধুরী মাকসুদুর রহমান সাহেব।

(৩) নাজিয়া নিগার,পিতা-মুবাশ্বের আহমদ সাহেব শহীদ (জার্মানী) এবং তিলমিয আহমদ বাট, পিতা- রাফিক আহমদ বাট (জার্মানী)

(৪) হিনা আহমদ বাট, পিতা- মুবাশ্বের আহমদ (জার্মানী) এবং নাজিব আহমদ শাহিদ, পিতা- মুবারক আহমদ শাহিদ (জার্মানী)।

(৫) ফারিহা মাহমুদ, পিতা- মিঞা তারিক মাহমুদ (ইতালি) এবং দানিশ মাহমুদ, পিতা- শাহিদ মাহমুদ (জার্মানী)।

(৬) উযমা আফযল, পিতা- আফযল মহম্মদ (ইতালি) এবং সাজ্জাদ ওহীদ সাহেব, পিতা-আশরফ মহম্মদ (জার্মানী)

(৭) নাদিয়া রুবাব, পিতা- মাকবুল আহমদ (রাবোয়া) এবং আশআর আহমদ, পিতা- মহম্মদ সেলিম (রাওলপিন্ডি, পাকিস্তান)

(৮) ইকরা খলীল, পিতা- খলীল আহমদ (রাবোয়া) এবং মহম্মদ ইসমাঈল খালেদ, পিতা- মহম্মদ ইকবাল (সিন্ধ, পাকিস্তান)।

(৯) তাহমিনা সাদাফ মির্যা, পিতা- নাসীর আহমদ মির্যা (কানাডা) এবং শাহযাদ বশীর আহমদ, পিতা-শাহবায আহমদ (যুক্তরাজ্য)

(১০) গাযালা খালিদ (ওয়াকফা নও) , পিতা-নাদীম আহমদ (জার্মানী) এবং শাহযাদ আহমদ আরিফ, পিতা- তারিক করীম (জার্মানী)।

(১১) নাজমুস সেহের শরীফ, পিতা- শরীফ আহমদ (সুইজারল্যান্ড) এবং ওফা মুহাম্মদ,মুরুব্বীসিলসিলা (সুইজারল্যান্ড)।

(১২) সায়েরা খলীল, পিতা-খলীল আহমদ (জার্মানী) এবং বাসিল আসলাম, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া, পিতা- মহম্মদ আসলাম।

(১৩) আসেফা ওয়াসীম জাভেদ, পিতা-ওয়াসীম আহমদ (জার্মানী) এবং আনিস আহমদ, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া জার্মানী, পিতা- মুহাম্মদ জাভেদ।

(১৪) ফারিহা খালিদ, পিতা-ফরিদ আহমদ খালিদ (জার্মানী) এবং নুরুদ্দীন আশরফ, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া জার্মানী, পিতা- মহম্মদ আশরফ যিয়া, মুরুব্বী সিলসিলা।

(১৫) শুমাইলা এজায (ওয়াকফা নও), পিতা-এজায আহমদ (জার্মানী) এবং মহম্মদ আদনান (ওয়াকফে নও), পিতা-মহম্মদ আশরফ তারোড় (জার্মানী)।

(১৬) সালমা নাসের, পিতা- নাসের আহমদ (জার্মানী) এবং নবীদ আহমদ, পিতা- শোয়েব আহমদ (জার্মানী)।

ইজাব ও কবুলের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন। দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) দুই পক্ষের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং অতঃপর বিশ্রামকক্ষের দিকে প্রস্থান করেন।

জুমআর খুতবা

হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর প্রথম বা দ্বিতীয় দিনই তাঁর হাতে বয়আত করে নিয়েছিলেন আর এটাই সত্য। কেননা, হযরত আলী কখনো হযরত আবু বকরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি এবং তার ইমামতিতে নামায পড়াও পরিত্যাগ করেন নি।

হযরত আলী (রা.)-এর অন্যসব গুণাবলীকে উপেক্ষা করা হলেও আমার দৃষ্টিতে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাঁর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা এমন সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যা একান্ত প্রশংসাযোগ্য, কেননা ইসলামের স্বার্থে তিনি (রা.) নিজের মান -সম্মান এবং নিজসত্তার কোন পরোয়া করেন নি এবং এত বড় বোঝা নিজের কাধে উঠিয়ে নেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান বদরী সাহাবা আবু তুরাব খলীফায়ে রাশেদা আঁ হযরত (সা.)-এর জামাতা হযরত আলি বিন আবি তালিব পবিত্র জীবনালেখ্য।

আমি পাকিস্তানের আহমদীদের বিশেষভাবে বলবো যে দোয়ার প্রতি যতটা মনযোগ দেওয়া দরকার ততটা মনোযোগ ও সচেতনতা নেই। তাই পূর্বের তুলনায় আরো বেশি দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবন্ধ করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সংকট থেকে আশু মুক্তি দিন এবং সহযসাধ্যতা সৃষ্টি করুন; আর প্রকৃত ইসলামের বাণী আমরা স্বাধীনভাবে পাকিস্তানেও এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তে যেন প্রচার করতে পারি।

আলজেরিয়া এবং পাকিস্তানে আহমদীদের প্রবল বিরোধীতার কথা দৃষ্টিপটে রেখে বিশেষ দোয়ার প্রতি আহ্বান।

চারজন মরহুমীনের স্মৃতিচার ও জানাযা গায়েব, যারা হলেন, চৌধুরী আব্দুর রাজ্জাক সাহেব শহীদের পুত্র ডক্টর তাহের আহমদ সাহেব (রাবোয়া), মাননীয় ডক্টর খলীফা তাকিউদ্দীন সাহেবের পুত্র মাননীয় খলীফা বশীরুদ্দীন সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী মাননীয়া আমিনা সাহেবা, এবং চৌধুরি আল্লাহ দিত্তা সাহেবের পুত্র হাবিবুল্লাহ্ মাযহার সাহেব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থকে প্রদত্ত ১৮ডিসেম্বর, ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১৮ ফাতাহ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। মহানবী (সা.)-এর (জীবনের) অন্তিম অসুস্থতায় হযরত আলী (রা.) যে সেবা করেছেন তার উল্লেখ বুখারীতে এভাবে রয়েছে যে, উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন- হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তাঁর রোগ বেড়ে যায় তখন তিনি তাঁর সেবা-শুশ্রূষা যাতে আমার ঘরে করা যায় এ লক্ষ্যে তাঁর সহধর্মিণীদের কাছ থেকে অনুমতি নেন । তারা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। তখন তিনি পা মাটিতে টেনে-হেঁচড়ে দু ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বের হন, আর তিনি (সা.) হযরত আব্বাস (রা.) এবং অন্য এক ব্যক্তির মাঝে ছিলেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) আয়েশা (রা.)'র গৃহেই ছিলেন আর সেখানে থেকেই তিনি মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে আসেন। হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি হযরত আব্বাস (রা.)'র কাছে সেকথার উল্লেখ করি যা হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন। তখন তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) যার নাম উল্লেখ করেছিলেন তুমি কি জানো সে কে ছিল? আমি বললাম, না। হযরত আয়েশা (রা.) যে দুজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাদের একজন ছিলেন হযরত আব্বাস, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যার নাম উল্লেখ করেন নি তিনি ছিলেন হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.)।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান,হাদীস-৬৬৫)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে তাঁর সেই অসুস্থতার সময় বের হন যাতে তিনি ইন্তেকাল করেন । লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হে আবুল হাসান! আজ সকালে মহানবী (সা.)-এর শরীর কেমন? তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ আজ প্রভাতে তাঁর শরীর ভালো। তখন হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) হযরত আলী (রা.)'র হাত ধরে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনদিন পর তোমরা অন্য কারো অধীনস্ত হয়ে যাবে কেননা খোদার কসম! আমি দেখতে পাচ্ছি, মহানবী (সা.) তাঁর এই অসুস্থতায় অচিরেই ইন্তেকাল করবেন। কেননা মৃত্যুর সময় বনু আব্দুল মুত্তালিবের চেহারা (কেমন হয়) তা আমার খুব ভালো জানা আছে। আসো আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে যাই এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করি, এ বিষয়টি অর্থাৎ খিলাফত কাদের মধ্য থেকে হবে? যদি আমাদের মধ্য থেকে হয় তাহলে আমরা জানতে পারবো আর আমারা ছাড়া অন্য কারো মধ্যে থেকে হলে তাও আমরা জানতে পারবো আর তিনি (সা.) আমাদেরকে এ সম্পর্কে নিশ্চয় কোন ওসীয়্যত করে যাবেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি একথা মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করি আর তিনি যদি আমাদের এ সম্মান না দেন তাহলে তাঁর (মৃত্যুর) পর লোকেরাও আমাদেরকে দিবে না। খোদার কসম! আমি মহানবী (সা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো না।

(সহী বুখারী কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪৪৪৭)

এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত। বুখারীর এই জায়গায় আরবী শব্দগুলো হলো, أَنْتَ وَاللّٰهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا - এ সম্পর্কে হযরত সৈয়্যদ ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব তার পুস্তকে এই নোট লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এটি ইঙ্গিতসূচক বাক্য হিসাবে সেই ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর অন্য কারো অধীনস্ত হয়ে যাবে আর একথার অর্থ হল, তিনদিন পর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করবেন।

(সহী বুখারী, অনুবাদ-হযরত সৈয়্যদ যায়নুল আবেদীন ওলীউল্লুহা শাহ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৭)

হযরত আমের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁকে হযরত আলী, হযরত ফযল এবং হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.) গোসল দিয়েছেন এবং তারাই তাঁকে কবরে নামান। আরেক রেওয়ায়েতে আছে, তারা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কেও নিজেদের সাথে নিয়েছেন।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-৩২০৯)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত করা সম্বন্ধে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়েতে আছে হযরত আলী (রা.) পূর্ণ আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তৎক্ষণাত হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। কেউ কেউ আবার এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। যাহোক, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, মুহাজির ও আনসাররা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হাতে বয়আত করে ফেলেন, তখন হযরত আবু বকর মিম্বরে উঠে তাকিয়ে

লোকেদের মাঝে কোথাও হযরত আলী (রা.)-কে দেখতে পেলেন না। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আনসারদের কয়েকজন গিয়ে হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে আসেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলীকে সম্বোধন করে বললেন, হে মহানবী (সা.)-এর চাচাত ভাই ও তার জামাতা! তুমি কি মুসলমানদের শক্তিকে খর্ব করতে চাচ্ছ? হযরত আলী (রা.) বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)-এর খলীফা, আমাকে পাকড়াও করবেন না। এটি বলে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করে নেন।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন আলী বিন আবি তালিব, পৃ: ১১৯)

তাবারির ইতিহাসে উল্লিখিত আছে, হাবীব বিন আবু সাবেত হতে বর্ণিত, হযরত আলী নিজ বাড়িতেই ছিলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো,হযরত আবু বকর (রা.) বয়আত নেওয়ার জন্য বসে আছেন। হযরত আলী দীর্ঘ আলখেল্লা পরিহিত ছিলেন, বয়আত করতে দেরী হয়ে হওয়াকে অপছন্দ করে সে অবস্থাতেই তাড়াহুড়ো করে কোন পাজামা ও চাদর ছাড়াই বাইরে বেরিয়ে আসেন। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং তার নিকটে বসে যান। এরপর তিনি তার কাপড় আনিয়ে কাপড় পরিধান করে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বৈঠকেই বসে থাকেন।

(তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর প্রথম বা দ্বিতীয় দিনই তাঁর হাতে বয়আত করে নিয়েছিলেন আর এটাই সত্য। কেননা, হযরত আলী কখনো হযরত আবু বকরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি এবং তার ইমামতিতে নামায পড়াও পরিত্যাগ করেন নি।

(আস সীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে কাসীর, পৃ: ৬৯৪)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত আলী সম্পর্কে বলেন, ''হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু প্রথমদিকে হযরত আবু বকরের হাতে বয়াতের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঘরে গিয়ে আল্লাহই জানেন, হঠাৎ কি মনে হল! পাগড়িও বাঁধেন নি আর টুপি পড়েই দ্রুত বয়াতের জন্য চলে আসেন আর এরপর পাগড়ি আনিয়ে নেন। মনে হয়, তার হৃদয়ে এ ধারণার উদ্রেক হয়ে থাকবে যে, এটি তো অনেক বড় পাপ । এ কারণে এত তাড়াহুড়ো করেন আর পাগড়িও বাঁধেন নি''

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

অর্থাৎ পুরো কাপড়ও পরিধান করেন নি এবং (বয়াতের জন্য) ছুটে আসেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী হযরত ফাতেমার মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়াত করেছিলেন। যেমনটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী হযরত ফাতেমার মৃত্যু পর্যন্ত বয়াত করেন নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪২৪০)

তবে, অনেক আলেম বুখারীতে বিদ্যমান এ রেওয়ায়েতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন বা প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন, ইমাম বায়হাকী 'সুনানুল কুবরা'তে ইমাম শাহাবুদ্দিন যুহরীর উক্তি, 'হযরত আলী হযরত ফাতেমার মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়আত করেন নি'- সম্পর্কে যা লিখেছেন এর অনুবাদ হল, হযরত আলী হযরত ফাতেমার মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়আত হতে বিরত ছিলেন- ইমাম যুহরীর এ উক্তিটি একটি মুনকাতে' হাদীস (যার সনদের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে নি)। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতটি বেশি সঠিক যাতে এ কথার উল্লেখ আছে যে, হযরত আলী সাকিফার পরে অনুষ্ঠিত গণবয়াতের সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন।

(আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদীস-১২৭৩২)

কতিপয় আলেম বুখারীতে উল্লেখিত এ রেওয়ায়েতের সমন্বয় করতে গিয়ে এই দ্বিতীয় বয়াতকে তারা বয়আত নবায়ন নাম দিয়েছেন। আলেমরা হয়ত ভেবেছেন যে বুখারীর মত গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতটির বিদ্যমান তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় , কোন কিছু অবশ্যই ঘটে থাকবে, যে কারণে হযরত আলীর দ্বিতীয় বয়াতের কোন নাম রাখা হয়েছে। কিন্তু বুখারীর সকল রেওয়ায়েত সঠিক হবে -তা আবশ্যক নয়। যেমন, ডক্টর আলী মুহাম্মদ সালাবী তার 'সীরাতু আমীরিল মু'মেনীন আলী বিন আবী তালেব শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু' পুস্তকে লেখেন, আল্লামা ইবনে কাসীর এবং আরো অনেক বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতে হযরত আলী হযরত ফাতেমা (রা.)-এর ইন্তেকালের ছয় মাস পর বয়াআত নবায়ন করেছেন।

(সীরাতু আমীরুল মোমেনীন আলি বিন আবি তালিব, পৃ: ১২১)

তারা এই বয়আতের নাম বয়াত নবায়ন রেখে দিয়েছেন, অর্থাৎ প্রথমেও বয়াআত করেছিলেন, হযরত ফাতেমা (রা.)-এর মৃত্যুর পর পুনরায় বয়আতের নবায়ন করেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর লেখেন, হযরত ফাতেমা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে নিজের বয়আতের নবায়ন করা সমীচীন বলে মনে করেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে কাসীর, পৃ: ৬৯৪)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আরবী পুস্তক সির্‌রুল খিলাফায় যা বলেন, এর অনুবাদ তুলে ধরা হচ্ছে। যারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে আর মনে করে যে আসলে সেসময় হযরত আলীই খলীফা হওয়া উচিত ছিল- এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমরা যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নিই, হযরত সিদ্দীকে আকবর এমন লোকদের অন্তভুক্ত ছিলেন যারা দুনিয়া এবং এর আকর্ষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এর আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং আত্মসাৎকারী ছিলেন; তাহলে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে একথাও স্বীকার করতে হবে, খোদার সিংহ হযরত আলীও মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ্। আর আমরা তাঁকে যেমন দুনিয়া বিমুখ খোদানুরাগী মনে করি প্রকৃতপক্ষে তিনি তেমন ছিলেন না, বরং তিনিও দুনিয়া ও এর মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন অধিকন্তু এর চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এ কারণেই কাফের ও মুরতাদদের সাথে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি (অর্থাৎ হযরত আবু বকরকে কাফের বলা হয় এবং খুব কঠিন ভাষা ব্যবহার করা হতো) বরং চাটুকারদের ন্যায় তাদের দলভুক্ত থাকেন। প্রায় ত্রিশ বছর তিনি 'তাকিয়া' অবলম্বন করে ছিলেন। প্রশ্ন হলো, আলী মুর্তজার চোখে যখন হযরত সিদ্দীকে আকবর কাফের ও আত্মসাৎকারীই ছিলেন, কেন তিনি সানন্দে তার বয়াআত করতে সম্মত হলেন? তিনি কেন নৈরাজ্য এবং মুরতাদদের দেশ ত্যাগ করে অন্য কোন দেশে হিজরত করলেন না? আল্লাহর ভূমি কি এতটা বিস্তৃত ছিল না যে মুত্তাকীদের রীতি অনুসারে তিনি সেখানে হিজরত করে চলে যেতেন? বিশ্বস্ত ইব্রাহীমের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, সত্যের অনুকূলে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কত বলিষ্ঠ ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন! তিনি যখন দেখলেন, তাঁর পিতা পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং জাতি মহাসম্মানিত ও পরাক্রমশালী প্রভুকে পরিত্যাগ করে প্রতিমাপূজায় মগ্ন, তখন তিনি ভীত না হয়ে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, দুষ্কৃতকারীদের ভয়ে 'তাকিয়া' অবলম্বন করেন নি। এটিই পুণ্যবানদের আদর্শ, তাঁরা তরবারি বা বর্শাকে ভয় করেন না। তারা 'তাকিয়া'কে সবচেয়ে বড় পাপ, অশ্লীল কাজ ও সীমালঙ্ঘন বলে মনে করেন। কোন কারণে এমন হীন কাজ যদি বিন্দুমাত্রও তাদের হাতে ঘটেও যায় তাহলে তারা ইস্তেগফার করতঃ আল্লাহর প্রতি বিনত হন বা প্রত্যাবর্তন করেন। আমরা বিস্মিত হই! হযরত আলী (রা.) জানতেন, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর ফারুক কুফরী করেছেন এবং অধিকার খর্ব করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি কীভাবে তাদের হাতে বয়আত করলেন? তাদের নৈরাজ্য, কুফর ও ধর্মত্যাগ সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের উভয়ের সাহচর্যে দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে তাদের আনুগত্য করছেন, কখনো কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করেন নি, কোন ঘৃণা প্রদর্শন করে নি, অন্য কোন বিষয়ও তার আন্তরিকতায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় নি এবং তার ঈমানী খোদাভীতিও তাকে একাজ থেকে বিরত রাখে নি। এছাড়া তার এবং আরব জাতিগুলোর মাঝে মেলামেশার বা যোগাযোগের দ্বার রুদ্ধ ছিল না, দীর্ঘ কোন অন্তরায়ও ছিল না আর তিনি কারারুদ্ধও ছিলেন না। এহেন পরিস্থিতে তার জন্য আবশ্যক ছিল কোন আরব অঞ্চলে বা পূর্ব কিংবা পশ্চিমের কোন অঞ্চলে হিজরত করা। পরিস্থিতি এমনই হয়ে থাকলে অর্থাৎ কোনরূপ জবরদস্তি করা হয়ে থাকলে তিনি হিজরত করতে পারতেন এবং মানুষকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তার কেবল হিজরত করাই উচিত ছিল না বরং লোকদেরকে যুদ্ধের জন্যও উদ্বুদ্ধ করা উচিত ছিল। কেননা তারা মুর্তাদ বা ধর্মত্যাগী ও কাফের, তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এছাড়া বেদুঈন বা মরুবাসীদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বীয় বাগ্মিতাপূর্ণ প্রাঞ্জল বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে নিজের পছন্দের কাজে নিয়োজিত করা আর মুরতাদ গোষ্ঠির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত ছিল।তিনি (আ.) বলেন, মুসায়লামা কাযযাবের সাথে প্রায় এক লক্ষ মরুবাসী সমবেত হয়েছিল, অথচ হযরত আলী (রা.)-এ সাহায্য করার বেশি অধিকার রাখতেন এবং তিনিই এ অভিযানকে সফল করার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, তিনি কেন কাফেরদের অনুসরণ করলেন? অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলীফাগণের তিনি কেন অনুসরণ করলেন যাদেরকে তোমরা কাফের

বলে থাক । তিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অলসদের মত বসে রইলেন আর মুজাহিদের ন্যায় কেন দণ্ডায়মান হলেন না! সফলতা ও উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কী তাঁকে এই অভিযানে বের হতে বারণ করেছিল? তিনি কেন যুদ্ধবিগ্রহ, সত্যের সমর্থন এবং লোকদেরকে আহ্বানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন না? তিনি কি জাতির মাঝে সবচেয়ে বাগ্মী বক্তা ও সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা বক্তৃতার মাধ্যমে জীবিত করতে পারে? স্বীয় বাগ্মিতা ও উন্নত বক্তৃতার বলে আর শ্রোতামণ্ডলির ওপর প্রভাব বিস্তারের গুণে মানুষকে নিজের কাছে একত্র করা তাঁর জন্য কেবল এক ঘন্টা বরং এর চেয়েও কম সময়ের ব্যপার ছিল। মানুষ যখন এক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের চতুর্পার্শ্বে সমবেত হলো তখন খোদার সিংহের কর্মকাণ্ড ভিন্ন কিছু হওয়া উচিত ছিল, যিনি মহান ক্ষমতাবান প্রভুর সাহায্যপুষ্ট এবং বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর প্রিয়ভাজন ছিলেন? সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা আর সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, তিনি শুধু বয়আত করেই ক্ষান্ত হন নি অর্থাৎ তিনি শুধু বয়আতই করেন নি বরং সব নামায হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর পিছনে পড়েছেন। এক বেলাও পিছিয়ে থাকেন নি আর আপত্তিকারীদের ন্যায় তাদেরকে এড়িয়েও চলেন নি। তিনি তাদের পরামর্শ সভায় বসেছেন, তাদের দাবির সত্যায়ন করেছেন এবং নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছেন আর কখনোই পিছপা হন নি। কাজেই গভীরভাবে প্রণিধান কর এবং বল! এগুলোই কি নিপীড়িত ও কাফের আখ্যাদাতা লোকদের লক্ষণ? এছাড়া এ বিষয়ের প্রতি গভীর মনোনিবেশ কর! মিথ্যাকথন ও প্রতারণা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তিনি অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) তাদের এমনভাবে অনুসরণ করেন যেন তার দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই? তিনি কি জানতেন না, যারা সর্বশক্তিমান খোদার ওপর নির্ভর করে তারা এক মুহূর্তের জন্যও চাটুকারিতা অবলম্বন করেন না , তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের জন্য পুড়িয়ে ফেলা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া বা টুকরো-টুকরোও করে ফেলা হলেও?

(সিররুল খুলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৯-৩৫১)

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, হযরত আলী (রা.) কখনো তাঁর পূর্ববর্তী খলীফাগণের বিরোধিতা করেন নি বরং তাঁদের বয়আত করেছেন। হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়আত করেন নি-মর্মে তোমরা যা কিছু বলে থাক, এ কথা তো হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে না বরং ক্ষুণ্ন করে।

তিন খলীফার যুগেই হযরত আলী (রা.) কোন্ কোন্ সেবামূলক অবদান রেখেছেন? মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আরবের অনেক গোত্র মুর্তাদ হয়ে যায় এবং মদীনাতেও মুনাফেকরা মাথাচাড়া দেয়। বনু হানিফা ও ইয়ামামার বেশিরভাগ লোক মুসায়লামা কায্যাবের দলে যোগ দেয়। অপর দিকে বনু আসাদ, ত্যায় এবং অন্যান্য গোত্রের অনেক লোক তুলায়হা আসাদীর সাথে সমবেত হয়। সেও মুসায়লামার ন্যায় নবুয়্যতের দাবি করে বসেছিল। বিপদ-আপদ অনেক বেড়ে যায় আর পরিস্থিতি চরমভাবে বিকৃতির শিকার হয়। এ অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী পাঠান তখন তাঁর কাছে কেবল অল্প সংখ্যক মানুষ রয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে অনেক বেদুইনের মনে মদীনা দখলের সাধ জাগে আর তারা মদীনায় আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র আঁটে। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মদিনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে এবং মদিনার আশপাশে পাহারাদার নিযুক্ত করেন যারা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাহারারত অবস্থায় রাত অতিবাহিত করত। এসব প্রহরাদারের তত্ত্বাবধায়কদের মাঝে ছিলেন হযরত আলী বিন আবু তালেব , যুবায়ের বিন আওয়াম, তালহা বিন আব্দুল্ল াহ্, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, আব্দুর রহমান বিন আওফ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)।

(আল বাদায়াতু ওয়ান নিহায়াহ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩০৭-৩০৮)

অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) তখনো সেনাবাহিনীর একটি অংশের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যারা নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ গণমানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তখন আরবের অধিকাংশ গোত্র মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় এবং যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেন। হযরত উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মুহাজের ও আনসারদের সাথে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। যখন নজদের উচ্চ ভূমির বিপরীত দিকের একটি পুকুরের কাছে পৌঁছেন তখন বিদ্রুঈনরা সেখান থেকে তাদের পরিবারপরিজন নিয়ে পলায়ন করে। প্রকৃত বিষয় হল, একদিকে তাদের মুসলমান হওয়ারও দাবিদার ছিল আর পুরোপুরি মুরতাদও ছিল না কিন্তু অপরদিকে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, এজন্য যুদ্ধ করা হয়েছিল। মুরতাদ হওয়ার কারণে তারা শাস্তি পাচ্ছিল- এমনটি নয়। তারা যখন পালিয়ে যায় তখন লোকেরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে নিবেদন করে, নিজ স্ত্রী-সন্তানদের কাছে মদিনায় ফিরে চলুন আর কাউকে সেনা বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে দিন। মানুষের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি খালিদ বিন ওয়ালীদকে সেনা বাহিনীর অ ামীর নিযুক্ত করেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, তারা যদি মুসলমান হয় বা বয়াত করে নেয় এবং যাকাত প্রদান করে, তখন তোমাদের মধ্যে যারা ফিরে আসতে চায় তারা ফিরে আসতে পারবে। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মদিনায় ফিরে আসেন।

(তারিখুল খোলাফা, প্রণেতা- জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বাকার সুয়ুতি, পৃ: ৬১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, হযরত উমর (রা.) নিজ খেলাফতকালে কতক সফরের সময় হযরত আলী (রা.)কে নিজের স্থলে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন তবারির ইতিহাস গ্রন্থে লেখা রয়েছে জিসরের ঘটনার সময় পারস্য সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যে এক ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তখন হযরত উমর (রা.) লোকদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত করলেন যে তিনি স্বয়ং ইসলামী সেনাদলের সাথে ইরান সীমান্তে উপস্থিত হবেন। সে সময় তিনি নিজের স্থলে হযরত আলীকে (রা.) মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

(হাক্কুল ইয়াকীন, আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৩-৩৮৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, জিসরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সবচেয়ে বড় এবং ভয়ংকর পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইরানিদের সাথে যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী যায়। ইরানি সেনাপতি নদীর অপরপারে নিজের সেনাবুহ্য গড়ে তোলে আর মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করে। ইসলামী সেনাবাহিনী উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে যায় আর তাদের ওপর হামলা করে এবং তাদেরকে পিছুহটিয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে যায়। কিন্তু এটি আসলে ইরানি কমান্ডারের একটি রণকৌশল ছিল। সে একটি সেনাদলকে পার্শ্বদেশ অর্থাৎ এক পাশ থেকে পাঠিয়ে সেতুর ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে এবং নতুন উদ্যমে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে। মুসলমানরা কৌশলগত কারণে পিছিয়ে যায় কিন্তু তারা দেখে শত্রুপক্ষ সেতু দখল করে রেখেছে। ভীত হয়ে অন্য দিকে গেলে শত্রুরা (তাদের ওপর) তীব্র আক্রমণ হানে, ফলে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয় এবং মৃত্যুও বরণ করে। মুসলমানদের এ ক্ষতি এতই ভয়ংকর ছিল যে, মদীনাও এতে কেঁপে উঠে। হযরত উমর (রা.) মদীনাবাসীদের একত্রিত করে বলেন, এখন মদীনা এবং ইরানের মাঝে আর কোন প্রতিবন্ধক নেই। মদীনা একেবারে অরক্ষিত হয়ে গেছে। হতে পারে কয়েকদিনের মধ্যেই শত্রুরা এখানে পৌঁছে যাবে। এজন্য আমি স্বয়ং কমান্ডার হিসেবে যেতে চাচ্ছি। অন্য লোকেরা এ প্রস্তাবটি পছন্দ করলেও হযরত আলী (রা.) বলেন, খোদা না করুন! আপনি যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে আর তাদের একতা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য অন্য কাউকে পাঠানো উচিত, আপনি স্বয়ং যাবেন না। এতে হযরত উমর (রা.) সিরিয়ায় রোমানদের সাথে যুদ্ধরত হযরত সা'দ (রা.) কে পত্র লিখেন, তুমি যত সংখ্যক সৈন্য পাঠাতে পার পাঠিয়ে দাও, কেননা মদীনা এখন একেবারেই অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। তাই শত্রুদের যদি এখনই থামানো না হয় তাহলে তারা মদীনা দখল করে নিবে।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২২, পৃ: ৫৬-৫৭)

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ফিতনা ও নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিলে সেটিকে প্রতিহত করার জন্য হযরত আলী (রা.) তাঁকে নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। একবার হযরত উসমান (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, দেশেব্যাপী বিরাজমান বিশৃংখলা ও দাঙ্গারহাঙ্গামার মূল হেতু কী আর তা নিরসনের উপায় কী? হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণভাবে এবং নিঃসঙ্কোচে বলেন, বর্তমান অস্থিরতার সবটাই আপনার কর্মকর্তাদের ভারসাম্যহীনতারই ফল। হযরত উসমান (রা.) বলেন, কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমিও তো সেসব বৈশিষ্ট্যই দৃষ্টিপটে রেখেছি যেগুলো হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টিতে ছিল, তথাপি তাদের প্রতি গণ-অসন্তোষের কারণ

ইমাম মাহদীর বাণী

স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৮)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

বুঝতে পারছি না। হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ এটি সত্য, কিন্তু হযরত উমর (রা.) সবার লাগাম নিজের হাতে রেখেছিলেন আর তার নিয়ন্ত্রন এত কঠোর ছিল যে, আরবের সবচেয়ে অবাধ্য উটও ছটফট করে উঠতো। অত্যন্ত কঠোর হস্তে নিগরানি করতেন। পক্ষান্তরে আপনি অপ্রয়োজনীয় মাত্রায় নমনীয়। আপনার কর্মকর্তারা আপনার এই কোমলতার সুযোগ নিয়ে যাচ্ছেতাই করে আর আপনি এর খবরও পান না। প্রজারা মনে করে, কর্মকর্তারা যা কিছু করছে এর সবই খিলাফতের দরবার থেকে প্রাপ্ত নির্দেশের অধীনেই করছে। এভাবে সমস্ত ভারসাম্যহীনতার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতে হয় আপনাকে।

যখন মিশরিয়রা হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি অবরোধ করে আর অবরোধে এতটা কঠোরতা অবলম্বন করে যে, খাদ্যপানীয়ের সরবরাহও বন্ধ করে দেয়, তখন হযরত আলী (রা.) জানতে পেরে অবরোধকারীদের কাছে যান এবং বলেন, তোমরা যে ধরণের অবরোধ দাড় করিয়েছ তা কেবল ইসলাম বিরোধীই নয় বরং মানবতাবিরোধীও বটে। কাফেররাও মুসলমানদের বন্দী করলে পানাহার থেকে বঞ্চিত রাখে না। হযরত উসমান (রা.) সম্বন্ধে হযরত আলী (রা.) বলেন এই ব্যক্তি তোমাদের কী ক্ষতি করেছেন যে, তোমরা (তাঁর সাথে) এমন কঠোর আচরণ করছ। অবরোধকারীরা হযরত আলী (রা.)-এর সুপারিশের কোন তোয়াক্কাই করে নি এবং অবরোধে ছাড় দিতে পু রোপুরি অস্বীকৃতি জানায়। হযরত আলী (রা.) রাগ করে তাঁর মাথার পাগড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে যান।

(সিয়ারুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৭-২০৮)

লোকেরা হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি অবরোধ করে, পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) উপর থেকে উঁকি মেরে দেখেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মাঝে কি আলী আছে? লোকেরা বলে, না। পুনরায় তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, সা'দ আছে? জবাব আসে, না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হযরত উসমান (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে আলীকে গিয়ে আমাদেরকে পানি পান করাতে বলবে। একথা অবগত হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) পানি ভর্তি ৩টি মশক হযরত উসমান (রা.) -এর বাড়ির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন কিন্তু বিদ্রোহীদের বাধার মুখে এই মশকগুলো হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল না, সেগুলো নিয়ে যেতে দিচ্ছিল না। এই মশকগুলো পৌঁছাতে গিয়ে বনু হাশেম ও বনু উমাইয়া গোত্রের বেশ কয়েকজন কৃতদাস আহত হয়। পরিশেষে সেই পানি হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়িতে পৌঁছে।

হযরত আলী (রা.) যখন জানতে পারেন হযরত উসমান (রা.)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে তখন তিনি তাঁর দুই পুত্র ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইনকে বলেন, নিজ নিজ তরবারি নিয়ে যাও এবং হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ির সদর দরজায় দাড়িয়ে যাও । সাবধান! কোন দাঙ্গাবাজ যেন তাঁর (রা.) কাছে যেতে না পারে।এটি দেখে বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ির দরজা লক্ষ্য করে তির ছুড়তে আরম্ভ করে যার ফলে হযরত হাসান (রা.) এবং হযরত মুহাম্মদ বিন তালহা (রা.) রক্তে রঞ্জিত হয়ে যান। ইতোমধ্যে দুজন সঙ্গীসহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর সন্তর্পণে এক আনসারী (প্রতিবেশীর) বাড়ির দিক থেকে টপকে হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাঁকে শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ পাওয়ার পর হযরত আলী (রা.) ঘটনাস্থলে এসে দেখেন, হযরত উসমান (রা.)কে সত্যিই শহীদ করা হয়েছে। তখন তিনি (রা.) তাঁর দুই পুত্রকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের দু'জনের প্রহরা থাকা সত্ত্বেও হযরত উসমান (রা.)কে কীভাবে শহীদ করা হলো? একথা বলে তিনি (রা.) হযরত হাসান (রা.)কে চপেটাঘাত করেন এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর বুকে ধাক্কা মারেন আর মুহাম্মদ বিন তালহা এবং আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)কে ভর্ৎসনা করে রাগান্বিত অবস্থায় সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসেন।

(তারিখুল খুলাফা, পৃ: ১২৩-১২৪)

শাদ্দাদ বিন অওস বর্ণনা করেন যে, ইয়ামু দ্বার-এ অর্থাৎ যেদিন বিদ্রোহীরা হযরত উসমানকে তাঁর ঘরে অবরুদ্ধ করে অত্যন্ত নৃশংসভাবে শহীদ করেছিল, হযরত উসমান এর অবরোধ যখন চরম রূপ ধারণ করে তখন হযরত উসমান উঁকি দিয়ে মানুষকে দেখেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখলাম হযরত আলী নিজের ঘর থেকে বাহিরে বের হচ্ছিলেন আর তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর পাগড়ি পরিহিত ছিলেন এবং নিজের তরবারি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সম্মুখে মুহাজের ও আনসারদের জামা'ত ছিল, যাদের মাঝে হযরত হাসান এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরও ছিলেন। এক পর্যায়ে তারা বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। অতঃপর তারা হযরত উসমানের গৃহে প্রবেশ করেন আর হযরত আলী নিবেদন করেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। মহানবী (সা.) এর ধর্মের উন্নতি ও দৃঢ়তা তখন লাভ হয়েছে যখন তিনি (স্বীয়) মান্যকারীদের সাথে নিয়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। খোদার কসম, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এরা আপনাকে অবশ্যই হত্যা করবে। অতএব আপনি আমাদেরকে তাদের সাথে লড়াই করার অনুমতি প্রদান করুন। উত্তরে হযরত উসমান বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তা'লাকে সত্য মানে এবং স্বীকার করে যে, তার ওপর আমার অধিকার রয়েছে, আমি তাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, সে যেন আমার খাতিরে কারো বিন্দু পরিমাণ রক্তও যেন না ঝরায় এবং আমার খাতিরে নিজের রক্তও যেন প্রবাহিত না করে। হযরত আলী পুনরায় একই অনুরোধ জানালে হযরত উসমান পুনরায় একই উত্তর প্রদান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি হযরত আলীকে হযরত উসমানের গৃহ থেকে বের হয়ে যেতে দেখি। তিনি তখন বলছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি জান যে, আমরা পুরো চেষ্টা করেছি। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে আসেন। তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তাকে বলে, হে আবুল হাসান! আগে যান এবং মানুষকে নামায পড়ান। হযরত আলী বলেন, আমি তোমাদের নামায পড়াতে পারব না যখন কিনা ইমাম অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। আমি একা নামায পড়ে নিব। এরপর তিনি একা নামায পড়ে ফিরে যান। হযরত আলীর পুত্র আসেন এবং তাকে বলেন, হে আমার পিতা! খোদার কসম, বিরোধীরা হযরত উসমানের গৃহে আক্রমণ করেছে। হযরত আলী বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন, খোদার কসম, তারা তাকে হত্যা করবে। মানুষ হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করে, হযরত উসমান কোথায় থাকবেন? অর্থাৎ শাহাদাতের পর (কোথায় থাকবেন)। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কসম, জান্নাতে (থাকবেন)। মানুষ জিজ্ঞেস করে, হে আবুল হাসান আর যারা হত্যা করেছে তারা কোথায় থাকবে? হযরত আলী বলেন, খোদার কসম, আগুনে (থাকবে)। তিনি এই কথা তিনবার বলেন।

(রিয়াযুন নাযারা ফি মানাকিবুল আশার, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৮-৬৯)

বিদ্রোহীরা যখন মদিনা অবরোধ করেছিল, সেই পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

"মিশরবাসীরা হযরত আলীর কাছে যায়। তিনি তখন মদিনার বাহিরে সেনাবাহিনীর একটি অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং তাদের (অর্থাৎ বিদ্রোহীদের) দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তারা তাঁর কাছে পৌঁছে নিবেদন করে যে, হযরত উসমান (রা.) অব্যবস্থাপনার কারণে এখন খিলাফতের যোগ্য নন। আমরা তাকে পৃথক করার জন্য এসেছি, আর আশা করি যে, তাঁর পর আপনি এই পদ গ্রহণ করবেন। হযরত আলী (রা.) উক্ত মুনাফেকদের কথা শুনে সেই ধর্মীয় আত্মাভিমানের বশবর্তী হয়ে, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন যা তার মর্যাদার লোকের পক্ষে যথোচিত ছিল, আর অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন এবং বলেন, সকল পুণ্যবান ব্যক্তি জানে যে, মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে যুল মারওয়া ও যু খুশব নামক স্থানে,তাবু স্থাপনকারী বাহিনী সমূহের উল্লেখ করে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছিলেন; (এটি সেই যায়গা যেখানে মিশরীয়রা ঘাঁটি স্থাপন করেছিল।)

(আল বাদাইয়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭ম খণ্ড, পৃ:১৭৪)

ওয়া অতএব খোদা তা'লা তোমাদের মন্দ করুন, তোমরা ফিরে যাও। এতে তারা বলে, বেশ ভালো, আমরা ফিরে যাচ্ছি। এই কথা বলে তারা ফিরে যায়।

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯৯)

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত এবং এরপর খলীফা হিসেবে হযরত আলীর হাতে বয়আত গ্রহণ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, তা ইতিপূর্বেও কোন প্রসঙ্গে একবার আমি উল্লেখ করেছি। পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলাম, এখন এখানে ঘটনা সংক্ষেপে আবার তুলে ধরছি। হযরত উসমান (রা.) যখন শহীদ হন, তখন সবাই হযরত আলীর কাছে ছুটে আসে, যাদের মাঝে সাহাবীরাও ছিলেন এবং অন্যান্যরাও ছিল। তারা সবাই একথাই বলছিলো যে, আলী হলেন আমীরুল মুমিনীন; তারা তার (রা.) বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমরা আপনার বয়আত

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

করছি, আপনি আপনার হাত এগিয়ে দিন, কেননা আপনিই এই দায়িত্বের জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্য। একথা শুনে হযরত আলী বলেন, এটি তোমাদের কাজ নয়, এটি বদরী সাহাবীদের কাজ। তাই বদরী সাহাবীগণ যার ব্যাপারে চাইবেন, তিনি-ই খলীফা হবেন। একথা শুনে সবাই হযরত আলীর সমীপে উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে, আমরা আর কাউকে আপনার চেয়ে অধিক এই পদের যোগ্য মনে করি না। তাই আপনি আপনার হাত এগিয়ে দিন যেন আমরা আপনার বয়আত গ্রহণ করতে পারি। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তালহা ও যুবায়ের কোথায়? এরপর হযরত তালহা সর্বপ্রথম কাছে এসে মৌখিকভাবে বয়আত করেন এবং হযরত সা'দ সর্বপ্রথম তাঁর হাতে হাত রেখে বয়আত করেন। হযরত আলী এই অবস্থা দেখে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং মিম্বরে চড়েন। হযরত তালহা প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি হযরত আলীর কাছে গিয়ে মিম্বরে চড়েন এবং তাঁর কাছে বয়আত করেন; তার পর হযরত যুবায়ের বয়আত গ্রহণ করেন এবং এরপর অবশিষ্ট সাহাবীগণ।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০৭)

হযরত উসমানের শাহাদাতোত্তর ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ হযরত উসমানকে যখন শহীদ করা হয় তখন নৈরাজ্যবাদীরা বায়তুলমাল লুটপাট করে এবং ঘোষণা দেয় যে, যে প্রতিরোধ গড়তে চাইবে, তাকে হত্যা করা হবে। মানুষজনকে সমবেত হতে দেওয়া হতো না। কেউ একত্রিত হতে পারত না; এখন যেভাবে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, তেমন পরিস্থিতি ছিল। মদিনাকে তারা কঠোরভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল এবং কাউকে বাহিরে যেতে দেওয়া হতো না। কিংবা বলা যায়, যেভাবে কারফিউ দেওয়া হয়, তেমন পরিস্থিতি ছিল। এমনকি, যে হযরত আলীর প্রতি তারা ভালোবাসার দাবি করতো, তাকেও আটকে দেওয়া হয়েছিল এবং মদিনায় মারাত্মক লুটপাট চালানো হয়। একদিকে ছিল এই অবস্থা আর অপরদিকে তারা এতদূর পর্যন্ত পাষণ্ডতার পরিচয় দিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সেই পবিত্র ব্যক্তি হযরত উসমানকে কেবল হত্যা করে ক্ষান্ত হয় নি বরং তাঁর মরদেহ তিন-চারদিন পর্যন্ত দাফন করতে দেয় নি। অবশেষে কয়েকজন সাহাবী মিলে রাতের বেলা গোপনে তাকে দাফন করেন। হযরত উসমানের সাথে কয়েকজন ক্রীতদাসও শহীদ হয়েছিলেন; তাদের মরদেহও দাফন করতে তারা বাধা দেয় এবং কুকুরের সামনে তাদের ছুঁড়ে দেয়। হযরত উসমান এবং ক্রীতদাসদের সাথে এই দুর্ব্যবহার করার পর নৈরাজ্যবাদীরা মদিনার অধিবাসীদের ছেড়ে দেয়, যাদের সাথে তাদের কোন শত্রুতা ছিল না; আর সাহাবীরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। পাঁচটি দিন এমন অবস্থায় কেটে যায় যে, মদীনার কোন শাসক ছিল না। নৈরাজ্যবাদীরা নিজেদের পক্ষ থেকে কাউকে খলীফা বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল যেন তাকে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সাহাবীদের কেউ-ই এটি সহ্য করেন নি যে, তারা সেসব মানু ষের খলীফা হবেন যারা হযরত উসমানকে হত্যা করেছে। নৈরাজ্যবাদীরা পালাক্রমে হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরের কাছে বারবার যায় আর তাদেরকে খলীফা হতে বলে, কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃতি জানান। তাঁরা যখন অস্বীকৃতি জানান এবং মুসলমানরা তঁাদের বর্তমানে অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করতে পারতো না, তখন নৈরাজ্যবাদীরা তাঁদের ক্ষেত্রেও জবরদস্তি আরম্ভ করে। কেননা তারা ভা বে, যদি কেউ খলীফা না হয়, তাহলে পুরো মুসলিম বিশ্বে আমাদের বিরুদ্ধে এক তুফান সৃষ্টি হবে। তারা ঘোষণা দেয় যে, দু'দিনের ভেতর যদি কাউকে খলীফা বানানো হয় তাহলে ভালো, নতুবা আমরা আলী, তালহা ও যুবায়ের এবং অন্য সব শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের হত্যা করব। এ কথায় মদিনাবাসীদের মাঝে শঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, হযরত উসমানকে যারা হত্যা করেছে, তারা আমাদের এবং আমাদের নারী ও শিশুদের সাথে না জানি কী করবে? তারা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে যায় এবং তাকে খলীফা হওয়ার জন্য বলে, কিন্তু তিনি (রা.) অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আমি যদি খলীফা হই তাহলে সবাই এটিই বলবে যে, আমি হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করিয়েছি আর এই বোঝা আমি বহন করতে পারব না। একই কথা হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন আর অন্য যাদেরকে খলীফা হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল সেই সাহাবীগণও অস্বীকৃতি জানান। পরিশেষে সবাই মিলে পুনরায় হযরত আলী (রা.)-এর কাছে যায় এবং বলে, যেভাবেই হোক আপনি এ ভার কাঁধে নিন। অবশেষে তিনি (রা.) বলেন, আমি কেবল এ শর্তেই এমন গুরুভার বহন করতে পারি যদি সবাই মসজিদে একত্রিত হয় এবং আমাকে গ্রহণ করে নেয়। অতএব সবাই মসজিদে একত্রিত হয় এবং তাকে (রা.) গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু কতক এটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়া না হবে ততক্ষণ আমরা কাউকে খলীফা হিসেবে মানব না। আবার কেউ কেউ বলে, বাহিরের মুসলমানদের মতামত না জানা পর্যন্ত কারো খলীফা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। এভাবে হযরত আলী (রা.) যদিও খলীফা হওয়ার বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু ফলাফল তাই সামনে আসে যার তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। পুরো ইসলামী বিশ্ব এ কথা বলতে আরম্ভ করে যে, হযরত আলী হযরত উসমানকে হত্যা করিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর অন্যসব গুণাবলীকে উপেক্ষা করা হলেও আমার দৃষ্টিতে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাঁর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা এমন সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যা একান্ত প্রশংসাযোগ্য, কেননা ইসলামের স্বার্থে তিনি (রা.) নিজের মান -সম্মান এবং নিজসত্তার কোন পরোয়া করেন নি এবং এত বড় বোঝা নিজের কাধে উঠিয়ে নেন।

(আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৩৫-৬৩৭)

অতঃপর হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত-পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে অন্যত্র হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দু -একদিন অনেক লুটপাট চলতে থাকে, কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত হলে সেই বিদ্রোহীরা নিজেদের পরিণতির কথা ভেবে চিন্তিত হয় এবং ভয় পায় যে, এখন কী হবে? অতএব কেউ কেউ এটি ভে বে যে, হযরত মুআবিয়া (রা.) একজন শক্তিশালী মানুষ আর তিনি অবশ্যই এই হত্যার প্রতিশোধ নিবেন, সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে এবং সেখানে পৌঁছে নিজেরাই হাহুতাশ আরম্ভ করে দেয় যে, হযরত উসমান (রা.) শহীদ হয়েছেন আর কেউ তার প্রতিশোধ নিচ্ছে না। তাদের কেউ কেউ পালিয়ে মক্কার পথে হযরত যুবায়ের (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে মিলিত হয় আর বলে, এটা কত বড় অবিচার যে, ইসলামের খলীফাকে শহীদ করা হবে অথচ মুসলমানরা নীরব বসে আছে। কতক পালিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পৌঁছে এবং বলে, এটি বিপদের সময়। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আপনি বয়আত গ্রহণ করুন যাতে মানুষের ভয় দূরীভূত হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হয়। মদিনায় উপস্থিত সাহাবীগণও সর্বসম্মতভাবে এই পরামর্শই প্রদান করেন যে, এই মুহূর্তে এটিই সমীচীন হবে যে, এই গুরুভার আপনি নিজের কাঁধে রাখুন, কেননা আপনার এ কাজ পুণ্য এবং খোদার সন্তুষ্টির কারণ হবে। চতুর্দিক থেকে যখন তাঁকে (রা.) বাধ্য করা হয় তখন কয়েকবার অস্বীকৃতি জানানোর পর তিনি বাধ্য হয়ে এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং বয়আত গ্রহণ করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী (রা.)-এর এই কাজ বড়ই প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ ছিল। তিনি (রা.) যদি তখন বয়আত না নিতেন তাহলে ইসলাম তার চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো যতটা তাঁর এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার যুদ্ধের ফলে হয়েছে। "

(আনোয়ারে খিলাফত,আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৭-১৯৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ফলাফল বের করেছেন। অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত! হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত থেকে বেরিয়ে গেছেন- এটি ভুল কথা। যেমনটি কথিত আছে যে, তারা বয়আত করেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বয়আত করেন আর পরবর্তীতে বয়আত ভঙ্গ করে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে চলে যান বা তাঁর [অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন- এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, এটি ভুল দৃষ্টান্ত এবং ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ। এমনটি ঘটে নি। ইতিহাস এ ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের হযরত আলী (রা.)-এর যে বয়আত করেন সেটি স্বেচ্ছায় ছিল না বরং তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক বয়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। অতএব মুহাম্মদ এবং তালহা দুইজন বর্ণনাকারীর বরাতে তাবরী-তে এই রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.) যখন শহীদ হন তখন লোকজন নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে,অতি সত্বর কাউকে খলীফা বানানো উচিত যেন শান্তি ফিরে আসে এবং নৈরাজ্যের অবসান ঘটে। অবশেষে মানুষহযরত আলীর কাছে যায়

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain, Bolpur, Dist-Birbhum

এবং তাঁকে অনুরোধ করে যে, আপনি আমাদের বয়আত নিন। হযরত আলী বলেন,যদি আমার হাতে তোমাদের বয়আত করতে হয় তাহলে সব সময় আমার আনুগত্য করতে হবে। যদি তোমরা এটি মেনে নাও তাহলে আমি তোমাদের বয়আত নিতে প্রস্তুত আছি, নতুবা তোমরা অন্য কাউকে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করে নাও, আমি সব সময় তাঁর অনুগত থাকব। আর যে-ই খলীফা হোক না কেন তোমাদের চেয়ে বেশি তাঁর আনুগত্য করব। তারা বলে আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করছি। হযরত আলী বলেন, পুনরায় চিন্তা কর এবং নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে নাও। অতএব তারা পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের যদি হযরত আলীর কাছে বয়আত করেন তাহলে অন্য সবাই হযরত আলীর কাছে বয়আত করবে, নতুবা যতদিন তারা হযরত আলীর হাতে বয়আত না করবে ততদিন পূর্ণরুপে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবেনা। তখন হাকিম বিন জাবালাকে কয়েক ব্যক্তির সাথে হযরত যুবায়েরের কাছে এবং মালেক আশতারকে কয়েক ব্যক্তির সাথে হযরত তালহার কাছে পাঠানো হয়, যারা তরবারির ভয় দেখিয়ে তাদেরকে বয়আতে সম্মত করে। অর্থাৎ তারা তরবারি উঁচিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে যে, হযরত আলীর হাতে বয়আত করলে কর,নতুবা আমরা তোমাদের এক্ষুনি হত্যা করব। অতএব তঁ ারা বাধ্য হয়ে বয়আতে সম্মতি প্রকাশ করেন আর তারা ফিরে আসে। পরের দিন হযরত আলী মিম্বরে উঠেন এবং বলেন , হে লোক সকল! তোমরা গতকাল আমাকে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলে আর আমি বলেছিলাম তোমরা এ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ। তোমরা কি চিন্তা করেছ ? আর তোমরা কি আমার গতকালের কথার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ? যদি প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক তাহলে স্মরণ রেখো যে, তোমাদেরকে আমার পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। এতে তারা পুনরায় হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরের কাছে যায় এবং তাদেরকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে। আর রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, তারা যখন হযরত তালহার কাছে পৌঁছেন এবং তাকে বয়আত করতে বলে তখন তিনি উত্তর দেন যে, **ইন্নী ইন্নামা উবায়েউ কারহান**। অর্থাৎ দেখ! আমি বাধ্য হয়ে বয়াত করছি, স্বানন্দে বয়াত করছি না। এভাবে লোকেরা যখন হযরত যুবায়েরের নিকট গেল এবং তাকে বয়াত করার কথা বলল, তখন তিনিও একই উত্তর দিলেন, **ইন্নি আন্নামা উবায়িউ কারহান** অর্থাৎ আমাকে তোমরা বলপ্রয়োগে বয়াত করাচ্ছ কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে এই বয়াত করছি না। এভাবে আব্দুর রহমান বিন জুনদুব তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করছেন, হযরত উসমানের হত্যার পর আশ্তার হযরত তালহার নিকট গেল এবং বয়াত করতে বলল। তিনি (রা.) বললেন, আমাকে সময় দাও। আমি দেখতে চাই যে, লোকেরা কি সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সে তাঁকে [অর্থাৎ হযরত তালহা (রা.) কে] কোনরূপ অবকাশ দিল না আর জাআ বিহি ইয়াতুল্লুহু তাল্লান আনিফান অর্থাৎ তাঁকে নির্মমভাবে মাটিতে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসল যেভাবে ছাগলকে টানাহেচড়া করা হয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৮, পৃ: ৩০০-৩০২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী হযরত তালহা (রা.) পারস্পরিক মতভেদের এক পর্যায়ে হযরত আলী (রা.)-এর বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়ে যান আর এরপর যখন তিনি এই বিষয়টি অনুধাবন করলেন যে, 'এতে আমারই ভুল ছিল' তখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান। এখন এই ঘটনাটি আরম্ভ হচ্ছে যে, হযরত তালহা (রা.) তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুদ্ধ করতে এলেন আর বয়াত গ্রহণ করেন নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখন সেই বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করছেন। হযরত তালহা প্রথমে বাধ্য হয়ে বয়াত গ্রহণ করেন কিন্তু পরবর্তীতে সুযোগ আসলে বিরোধীতায় দণ্ডায়মান হয়েছেন এবং হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছেন কিন্তু প্রকৃত বিষয় যখন তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে, হযরত আলী (রা.)ই সঠিক; তখন তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে চলে যান। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, যখন হযরত তালহা বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন কোন এক বর্বর ব্যক্তি যে কিনা নিজেকে হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচয় দিত, পথিমধ্যে তাঁকে হত্যা করলো এবং হযরত আলী (রা.)-এর নিকট এসে পুরস্কারের প্রত্যাশী হয়ে বললো 'আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আপনার শত্রু তাল্হা আমার হাতে নিহত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) তাকে বলেন, আমি তোমাকে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিচ্ছি। আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি-'তালহাকে এক জাহান্নামী হত্যা করবে"।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৬, পৃ: ৩৮৫)

একই ঘটনা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হাকেম বর্ণনা করেন, সওর বিন মাজযা আমাকে বলেছেন, জামালের যুদ্ধের দিন হযরত তালহার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। তখন তিনি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোন দলে আছ? আমি বললাম আমি হযরত আমীরুল মু'মিনিন আলী (রা.)-এর দলের সদস্য। তখন তিনি বলেন, তোমার হাত দাও, যাতে আমি তোমার হাতে বয়াত করতে পারি। অতএব তিনি আমার হাতে ধরে বয়াত করেন এবং ইহধাম ত্যাগ করেন। আমি হযরত আলীকে (রা.) পুরো ঘটনা শুনাই। তিনি (রা.) শুনে বলেন আল্লাহু আকবার! মহানবী (সা.)-এর কথা কত সুন্দর ভাবে সত্য প্রমানিত হলো! আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যে, তালহা যেন আমার বয়াত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ না করেন।

(আল কাউলুল ফসল, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৮-৩১৮)

(তিনি আশারায়ে মুবাশ্বিরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতের শুভসংবাদ দেওয়া হয়েছিল।)

যদিও প্রথমে বাধ্য হয়ে বয়াত করেছিলেন কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি মৃত্যুর পূর্বে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে স্বস্ফুর্তভাবে বয়াত করেছিলেন। পুণ্যবান মানুষ ছিলেন আর আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত প্রদানের প্রতিশ্রুতিও ছিল। অতএব তিনি খেলাফতের বয়াতের বাইরে থাকবেন- আল্লাহ্ তা চান নি। তাই সুযোগ পেয়ে তিনি খলিফার হাতে বয়াত করেছেন। এ ঘটনা চলমান রয়েছে আগামীতেও অব্যহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

আজ আমি পুনঃরায় আলজেরিয়া এবং পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়ার আহবান জানাতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিরাপদ রাখুন। আলজেরিয়ায় পরিস্থিতি কঠিনতর করে তোলা হচ্ছে। সেখানে এমন একজন সরকারী উকিল আছে, যে বারবার আহমদীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করছে। একই ভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের সমস্যার মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যারা এই সংকট সৃষ্টি করছে বা যারা কোনভাবে বিরোধীতা করছে,তাদেরকে আল্লাহ্ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। পাশাপাশি যেসব আহমদী বিভিন্ন সংকট ও কঠোরতার মাঝে দিনাতিপাত করছেন, তাদের জন্য সহজ সাধ্যতা সৃষ্টি করুন। পরিস্থিতি ঠিক করে দিন এবং সমস্যা দূর করে দিন।একই সাথে আমি পাকিস্তানের আহমদীদের বিশেষভাবে বলবো যে দোয়ার প্রতি যতটা মনযোগ দেওয়া দরকার ততটা মনোযোগ ও সচেতনতা নেই। তাই পূর্বের তুলনায় আরো বেশি দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সংকট থেকে আশু মুক্তি দিন এবং সহযসাধ্যতা সৃষ্টি করুন; আর প্রকৃত ইসলামের বাণী আমরা স্বাধীনভাবে পাকিস্তানেও এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তে যেন প্রচার করতে পারি।

নামাজের পর আমি কয়েক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা রাবোয়া নিবাসী ডাক্তার তাহের আহমদ সাহেবের। তিনি নওয়াবশাহ জেলার প্রাক্তন আমীর শহীদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের পুত্র। গত ৪ঠা ডিসেম্বর ৬০ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন

তিনি সরকারী চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রথমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন । অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি মিটঠিতে বদলী নেন, যাতে ওয়াকফে জাদীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আল মেহেদী হাসপাতালে সেবাদান করতে পারেন। ডাক্তার সাহেব একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আর প্রতি রবিবার ও প্রত্যেক সন্ধ্যায় আল মেহেদী হাসপাতালে চোখের রোগীদের চিকিৎসা করতেন। ছুটির দিনে আল মেহেদী হাসপাতালে চলে আসতেন। নিয়মিত মেডিকেল ক্যাম্পে অংশ নিতেন। অনেক ক্ষেত্রে সারা দিন অপারেশনে ব্যস্ত থাকতেন। থারপারকারেশুধু আহমদী নয় বরং অআহমদীদের মাঝেও তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি সর্বজন প্রিয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।তার হার্টের বাইপাস অপারেশনও করা হয়েছিল। জীবনের শেষ বছরগুলোতো তিনি দুই তিন বার মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্তেও তিনি থারপারকার জেলায় কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি মিটঠিতে প্রায় ১৫ বছর মানবসেবায় অতিবাহিত করেছেন। তিনি গরীব দুঃখীদের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ও অথিতিপরায়ন মানুষ ছিলেন। খেলাফত এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় যৌবনেই ওসীয়্যত করেছিলেন। সকল আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহউদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। এবং তার বংশধরদের তার পুণ্যের পথে চলার এবং প্রতিষ্ঠিত থাকার সামর্থ দান করুন। (শেষাংশ শেষের পাতায়....)

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

লিথোনিয়া থেকে আগত অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

লিথোনিয়া থেকে ৮জন সদস্য সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন ছাত্র, প্রফেসর, কলেজ প্রবন্ধক এবং উকিল।

সাক্ষাতের শুরুতে সদস্যরা প্রথমে নিজেদের পরিচয় দেন। এরপর এক সদস্য প্রশ্ন করেন যে, হুযুর আনোয়ার তাঁর ভাষণ কি নিজে লেখেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি নিজেরই জানা থাকে না যে কি বলতে হবে। আজকের খুতবা সম্পর্কে কালকে চিন্তা করেছিলাম। ভাষণগুলি আমিই তৈরী করি। কিছু উদ্ধৃতির জন্য অফিসের সাহায্য নিই। বক্তব্যের বিষয়বস্তু আমি নিজেই নির্বাচন করি আর উদ্ধৃতির জন্য বলে দিই যে আমাকে অমুক অমুক উদ্ধৃতি বের করে দাও।

এক সদস্য প্রশ্ন করেন যে, ইসলামে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ কেন?

উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: শূকরের মাংস খাওয়া তো বাইবেলেও নিষিদ্ধ।

এক সদস্য প্রশ্ন করেন, হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন কাজের জন্য কিভাবে সময় বের করেন?

উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি নিজেই জানি না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই সব কাজ হয়ে যায়। পূর্বে আমার জীবনের রীতি একেবারেই অন্য রকম ছিল। কিন্তু খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার রীতিনীতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমি জানি এটা কিভাবে হল? আল্লাহ্ সমস্ত কিছু করেছেন।

এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে ইসলাম চারটি বিয়ের অনুমতি কেন দিয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, চারটি বিয়ের অনুমতি আছে শর্তসাপেক্ষে। যেমন দুটি, তিনটি বা চারটি বিয়ে করার যে অনুমতি কুরআন করীমে আছে তা যুদ্ধ পরিস্থিতি দৃষ্টিপটে রেখে হতে পারে। যেমন বিশ্ব যুদ্ধ হওয়ার পর অনেক পুরুষ নিহত হয়েছিল আর এখানে জার্মানীতে বহু মানুষ মারা গিয়েছিল আর পরিণামে বিশাল সংখ্যক মহিলারা তাদের পরিবারে থেকে গিয়েছিল। যদি চারটি বিয়ের অনুমতি থাকত, তবে এই সব মহিলাদেরও বিয়ে হয়ে যেতে পারত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামের পূর্বেও একাধিক বিবাহ হত, লোকে একাধিক স্ত্রী রাখত। তারা হয় খৃষ্টান ছিল বা ধর্মহীন ছিল বা পৌত্তলিক ছিল। তারা অনেক সংখ্যক, যেমন কুড়িটি বা ত্রিশটি করে স্ত্রী রাখত। যে যত ধনী মানুষ হত, তার স্ত্রীর সংখ্যা তত বেশি হত। আফ্রিকাতে আজও কিছু কিছু এলাকায় প্রথা প্রচলিত আছে যে, যেখানকার প্রধানরা একাধিক স্ত্রী রাখে। আর তারা আহমদী হওয়ার জিজ্ঞাসা করে যে এখন তাদের কি করণীয়। এরপর তাদেরকে বলা হয় যে, চারজন স্ত্রীকে রেখে দিয়ে বাকিদের উত্তররূপে স্ত্রীত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দাও। কাজেই ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যাকে সীমিত মাত্রায় নামিয়ে এনেছে। এছাড়াও এর উপর একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেমন তাদের সঙ্গে ন্যায় কর। একাধিক স্ত্রী রাখতে হলে সব থেকে বড় শর্ত হল তাদের প্রতি ন্যায়সুলভ আচরণ কর। কোন একজন স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি নেই।

সেই ভদ্রমহিলাই প্রশ্ন করেন যে, চারটিই বা কেন পাঁচটি কেন নয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি পাঁচটি হত, তবে আপনি প্রশ্ন করতেন পাঁচটিই কেন, ছয়টি কেন নয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া আরও একটি পরিস্থিতি হল প্রথম স্ত্রীর সন্তান না থাকা। আর যদি পুরুষের সন্তানের বাসনা থাকে, তবে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। অনেক স্ত্রী অসুস্থ হয় আর সে পুরুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এমতাবস্থায়ও সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। অনুরূপভাবে কিছু অন্যান্য প্রয়োজনও আছে যার জন্য পুরুষকে একাধিক বিবাহ করতে হয়। অনুরূপভাবে কিছু ধর্মীয় প্রয়োজনের জন্যও কিছু লোককে একাধিক বিয়ে করতে হয়। কিছু পুরুষ এমন আছে যারা মনে করে তাদের একটি স্ত্রী দিয়ে প্রয়োজন মিটবে না। এমন পুরুষ এদিক ওদিক না গিয়ে বা অসৎ কোন কর্মে লিপ্ত না হয়ে বরং যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে, তবে তা তার জন্য শ্রেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পরিবারে পবিত্র পরিবেশ তৈরী করা জরুরী। যদি পুরুষের চাহিদা না মেটে তা পরিবেশের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা শ্রেয়। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, পুরুষ যদি জানত যে স্ত্রীর অধিকারসমূহ কি কি আর সেই অধিকারগুলি প্রদান না করলে কতটা পাপ হয়, তবে দুই-তিনটি বিয়ে তো দূরের কথা, পুরুষ হয়তো একটি বিয়েও করবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলাম মানুষকে সহজাত পুণ্য-প্রবৃত্তি এবং বাস্তবের নিকটবর্তী করে। এখানে যে ৬৫ কিম্বা ৭৫ শতাংশ তালাক হয়, তার কারণ হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকে না। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, পুরুষরা কোথাও না কোথাও সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। হয়তো কোথাও কোথাও মহিলারাও লিপ্ত থাকে। কিন্তু সচরাচর পুরুষদের উপরই এই অভিযোগ আরোপিত হয় আর মহিলারা এই কারণে তালাক নিয়ে ফেলে। প্রকৃতির একটি নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অনুসারে না চললে এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই এই মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখতে ইসলাম একাধিক বিয়ে করার নির্দেশ দেয়, যাতে পারস্পরিক বিশ্বাস অক্ষুন্ন থাকে। প্রথম স্ত্রীর বিশ্বাস হারিয়ে এবং নোংরাকাজে লিপ্ত না হয়ে বরং স্ত্রীকে সম্মত করে নিজের চাহিদা মেটাতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহ কর, যাতে প্রথম স্ত্রীর বিশ্বাসও বজায় থাকে।

সেই ভদ্রমহিলাই প্রশ্ন করেন যে, পুরুষদের মধ্যে যদি এমন ব্যধি থাকে তবে মহিলার কি করণীয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পুরুষদের যদি এমন ব্যধি থাকে তবে স্ত্রী 'খুলা' নিক বা তার থেকে পৃথক হয়ে যাক। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি চাই যে পুরুষ যেন দ্বিতীয় বিয়ে না করে, সেক্ষেত্রে স্ত্রী 'খুলা' নিতে পারে। পুরুষদের যেমন তালাকের অধিকার আছে, তেমনি স্ত্রী সন্তুষ্ট নাহলে স্বামীর থেকে তার 'খুলা' নেওয়ার অধিকার আছে, স্বামী থেকে পৃথক সে হতে পারে। এক্ষেত্রে পুরুষ তার সেই স্ত্রীকে পরিপূর্ণ অধিকার সহকারে বিদায় দিবে। আর যদি সেই স্ত্রী থেকে কোন সন্তান থাকে, তবে সন্তানের যাবতীয় অধিকার সমূহ বিধান মোতাবেক সে প্রদান করবে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবীতে এমনও এক গোত্র আছে, যেখানে মেয়েদের একাধিক পুরুষকে বিয়ে করার অধিকার আছে। আর এভাবে তাদের বংশক্রম চলতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে জানা যায় না যে সন্তান কার? সাধারণত প্রত্যেক সমাজেই পুরুষদের থেকেই বংশের ধারা চলতে থাকে। এই জন্য পুরুষ চারটি বিয়ে করতে পারে আর পুরুষদের প্রয়োজন মহিলাদের প্রয়োজনের থেকে বেশি। এজনও তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহিলা যদি একাধিক বিয়ে করে, তবে বোঝা যাবে না যে কার বংশক্রম চলছে।

রাশিয়ান অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

এবছর রাশিয়া থেকে চল্লিশজন অতিথি জার্মানীর জলসায় এসেছিলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন, রাশিয়ান, তাতার, তাজিক, আর্মেনিয়ান, উজবুক,কাযাক, চেচেয়ান প্রভৃতি জাতির মানুষ। অতিথিরা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ও ভাবাবেগ ব্যক্ত করেন।

হুযুর আনোয়ার সর্ব প্রথম সদস্যদের সঙ্গে কুশল বার্তা বিনিময় করেন।

এক কাযাক অতিথি বলেন, '২০০০ সালে আমি বয়আত করেছিলাম। কিন্তু আজ আমি

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

খোদাতালার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী।"

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin , Barisha (Kolkata)

জীবনে এই প্রথম হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করছি।

কিরঘিযিস্তানের অতিথি বলেন, তিনি আজ বয়আত করার সিদ্ধান্ত নেন আর আজ তিনি বয়আত করবেন।

এরপর তিনি বলেন, গতবছর হুযুর আনোয়ার আমার স্ত্রীর জন্য ওষুধ প্রস্তাব করেছিলেন। আমার স্ত্রী আল্লাহ্ কৃপায় এখন সুস্থ আছেন। আমি এজন্য হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জনাতে চাই।

এক অতিথি প্রশ্ন করেন যে, অনেকে বলে, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ভালবাসার ধর্ম। ইসলাম শান্তি ও ভালবাসার ধর্ম হয়, তবে ইসলামের এত কঠোর শাস্তি কেন রয়েছে? প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর বিধান কেন রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যতদিন পর্যন্ত কুরআন করীমে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত কোনও শিক্ষা অবতীর্ণ হয় নি, ততদিন ইহুদীদের শিক্ষা মোতাবেক শাস্তি দেওয়া হত। ইসলামি শিক্ষায় শাস্তির ক্ষেত্রে অনেক কোমলতার দিক রয়েছে। ইহুদী শিক্ষানুসারে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর বিধান ছিল, কিন্তু পরে কুরআন করীম কেবল চাবুকাঘাতের শাস্তির উল্লেখই করেছে মাত্র।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ব্যাভিচার করেছি। আল্লাহ্‌র কেতাব এর নির্দেশ আমার উপর কার্যকর করুন। রসূল করীম (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় বলল, আমার দ্বারা পাপ সম্পাদিত হয়েছে। তিনি পুনরায় তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেই ব্যক্তি তৃতীয়বার বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমি ভুল করেছি। আমার উপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকর করুন। এমনকি চারবার এভাবে যখন সে বলল, তখন নবী করীম (সা.) তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যদণ্ড দেওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু যখন তার উপর পাথর নিক্ষেপ করা হতে লাগল, সে পাথরের আঘাতে আহত হল, তখন সে সহ্য করতে না পেরে পালাতে উদ্যত হল। লোকেরা তাকে ধরে এনে হত্যা করল। লোকেরা যখন নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে একথ বর্ণনা করল, তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে কেন দিলে না? হয়তো সে তওবা করত আর আল্লাহ্ তার তওবা গ্রহণ করে নিতেন!

হুযুর আনোয়ার বলেন, এভাবেই রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে আর চরমপন্থী লোকেরা এটিকে ধরে বসে আছে। অথচ কুরআন করীম থেকে একথা প্রমাণিত হয় না।

একথাও রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আমি আল্লাহ্‌র সীমারেখার বিরুদ্ধাচরণ করেছি। আমার উপর শাস্তি কার্যকর করুন। আঁ হযরত (সা.) তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। এরপর নামাযের সময় হল, আঁ হযরত (সা.) নামায পড়ালেন। নামাযের পর সেই ব্যক্তি হুযুর (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি আল্লাহ্‌র সীমারেখা উলঙ্ঘন করেছি।আমার উপর আল্লাহর আদেশ কার্যকর করুন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তুমি কি আমাদের সঙ্গে নামায পড়নি? সে উত্তর দিল, 'পড়েছি।' তিনি (সা.) বললেন, তবে আল্লাহ্ তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাজেই ইসলামী শাস্তিতে একদিকে যেমন কঠোরতা আছে, তেমন কোমলতাও আছে। আঁ হযরত (সা.) ছিলেন মূর্তমান করুণা।

এক রাশিয়ান আহমদী খৃষ্টধর্ম থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। এবছর মার্চেই তিনি বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি অধীর আগ্রহে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই শুভক্ষণে তাঁর আনন্দ লুকানো যাচ্ছিল না। ছবি তোলার পূর্ব মুহূর্তে তিনি ভালবাসার উচ্ছ্বাসে হুযুর আনোয়ারের হাত চুম্বন করেন। পরে তিনি জানান, 'এটি আমার সারা জীবনের আনন্দ আজকের এই মুহূর্ত ও আনন্দের চেয়ে অনেক বেশি ভারি। আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে মাত্র তিন মাসের মধ্যেই আমি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে যাব।

এক ভদ্রমহিলা তার প্রতিবন্ধী সন্তানকে সঙ্গে এনেছিলেন। হুযুর আনোয়ার তাঁর সন্তানকে নিজের হাতে ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করেন। এতে ভদ্রমহিলা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি প্রায় আধ-ঘন্টা কাঁদতে থাকেন আর বলতে থাকেন যে, আমি সারা জীবনে কল্পনা করি নি যে, এমন পুন্যময় ব্যক্তির সঙ্গে কখনও সাক্ষাত করব আর তিনি এভাবে স্নেহ ও ভালবাসা দিবেন। ১১ বছরের সেই প্রতিবন্ধী কিশোরটি হাঁটতে পারে না। তবে সব কথা বুঝতে পারে আর ইঙ্গিতে কয়েকটি শব্দে উত্তর দেয়। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত কেমন ছিল? সে হেসে উপরে হাত তুলে বলল, 'খারাশু' অর্থাৎ খুব ভাল ছিল।

ক্রোয়েশিয়ান অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

এক অতিথি প্রশ্ন করেন যে, আপনি খলীফা হওয়ার পর আপনার জীবনে কি কি পরিবর্তন এল আর তা আপনার পারিবারিক জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক বড় পরিবর্তন এসেছে। আমার প্রাত্যাহিক রুটিন আজকের রুটিনের থেকে অনেক আলাদা ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যা কিছু আমি করি তা সব জামাতের সেবা। তাই অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমাকে সেই সব কাজও করতে হয়, যেগুলি করতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। আমার মনে নেই, কালেভদ্রে হয়তো আমি কোনও বক্তব্য রেখেছি বা কোন মঞ্চে এসেছি। কিন্তু এখন এত বেশি এসব কিছু করতে হয় যা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, 'আমি একজন খৃষ্টান, কিন্তু কুরআন করীম আমার দৃষ্টিতে একটি সত্য আর এটি বাইবেলের থেকেও আমার হৃদয়ের কাছে রয়েছে। আমি দুটিরই অধ্যয়ন করছি, প্রতিদিন তুলনামূলক অধ্যায়ন করে দেখছি। এটি অত্যন্ত কৌতুহলজনক কাজ।

হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, তিনি আইন নিয়ে পড়ছেন আর অবসর সময়ে তিনি অধ্যায়ন করেন। আর এই কাজ কৌতুহলজনক। যেমন আমি বন্ধুদেরকে বলি, শূকর ভক্ষন করা বাইবেল অনুসারে নিষিদ্ধ। কিন্তু একথা কারোর জানা থাকে না।

তিনি বলেন, আমি আহমদীদের একটি বিষয় বুঝে উঠতে পারি না যে, তারা মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণের চিত্র দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে। আমি জানি, মসীহ (আ.) এবং আপনি আধ্যাত্মিক সত্তা। কিন্তু আমার কাছে চিত্র কোন আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রাখে না। যেমন ঈসা (আ.)এর মান্যকারীদের জন্য বা মহম্মদ (সা.)-এ মান্যকারীদের জন্য তাঁদের চিত্রের প্রয়োজন নেই। আর তাঁদের বাণী স্মরণ করার জন্য আপনাদের কোন চিত্রের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ কারো কাছে খোদার চিত্র নেই, কিন্তু আমরা তাঁর উপর ঈমান আনি। তাই আমার প্রশ্ন হল ছবি কেন রাখা হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদিও ছবিগুলি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ভালবাসার কারণে লাগানো হয়। যেমনটি আপনারা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের ছবি লাগিয়ে থাকেন। তাই এটি একটি ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে, এই ছবিগুলি কোন আধ্যাত্মিক প্রভাব রাখে,তবে সম্পূর্ণ ভুল। ছবির মধ্যে এমন কিছু নেই। এই জন্য আমাদের জামাতে ফিকার জন্য একটি কমিটি রয়েছে আর অনেক সময় পূর্বে তারা একটি ফতোয়া দিয়ে রেখেছেন যে, যদি কোথাও একথা মনে করে ছবি লাগানো হচ্ছে যে, এর দ্বারা কিছু অর্জিত হবে বা এর সামনে অবনত হবে,তবে ছবি লাগানোর অনুমতি নেই। এমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ছবি লাগানোরও অনুমতি নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার মনে এক কৌতুল উদ্দীপক কথা এসেছে। আর তা হল, মসীহ দুইজন। একজন হলে হযরত মূসা (আ.)-এর মসীহ আর অপরজন হলেন আঁ হযরত (সা.)-এর মসীহ। আমি মনে করি, মূসা এবং আঁ হযরত (সা.) উভয়ের মসীহই নবী। আর আমি ঈসা (আ.)কে নবী বলে বিশ্বাস করি। আর উভয়ের চিত্র বিদ্যমান। হযরত ঈসা (আ.)এর চিত্র মসীহ্‌র কাফনে রয়েছে আর আমার বিশ্বাস অনুসারে এটি ঈসা (আ.)-এর আসল ছবি। অপরদিকে হযরত

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এরও ছবি এখনও সংরক্ষিত আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর ছবি সর্বত্র দেখানো বা প্রদর্শন করা পছন্দ করেন নি। একবার এমন হয় যে, তাঁর এক একনিষ্ঠ সাহাবী তাঁর ছবি পোস্টকার্ডে ছাপিয়ে দন। সেই যুগে পোস্ট কার্ড ছাপানোর রীতি ছিল। যখন তিনি (আ.) একথা জানতে পারলেন, তখন তিনি সমস্ত পোস্টকার্ড পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কাজেই কেবল ছবি কিছু করতে পারে না। কিন্তু কিছু এমনও মানুষ আছেন যারা মানুষের চেহারা দেখে তাদের সত্যতা সম্পর্কে জেনে যান। আর এমনটি হয়েওছে। ইউরোপ, আফ্রিকায় এমন অনেক মানুষ যারা বয়আত করেছেন, তারা আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে, তারা স্বপ্নে কাউকে দেখেছেন আর তারা সেই ব্যক্তিকে চেনে না। আর সেই ব্যক্তি স্বপ্নেই তাকে বলল, এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও কিম্বা স্বপ্নদ্রষ্টাকে কোনও পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। আর পরে যখন কোন আহমদী বন্ধু তাদেরকে সেই ছবি দেখিয়েছে, নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়েছে বা কোন ম্যাগাজিনে ছবি দেখিয়েছে, তখন তারা অকপটে স্বীকার করেছে যে, 'এই সেই ব্যক্তি যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই অনেকে এমন আছেন যারা মানুষের চেহারা দেখে সত্য চিনে নেয় আর কিছু মানুষের মধ্যে এই ক্ষমতা রয়েছে, যারা ছবি দেখে অনেক বুঝে যায়। এটিই কারণ। এছাড়া আর কোনও উপকার নেই। যদি কেউ মনে করে যে এর দ্বারা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি হয় তবে তা মোটেই না। আমি নিজেও এই জিনিসটি পছন্দ করি না। ২০০৬ সালে আমি যখন অস্ট্রেলিয়ার সফর করি, তখন সেখানকার জামাত ডাক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার ছবিযুক্ত একটি ডাকটিকিট জারি করায়। আমি বিষয়টি জানতে পেরে সমস্ত টিকিট নষ্ট করে দেওয়ার নির্দেশ দিই।

এক সদস্য প্রশ্ন করেন যে, একজন খলীফা ছাড়া বাকি সকলেই একই পরিবারের। এটা কি করে হল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত, তাঁরই ইচ্ছা। যেভাবে তিনি চান, সেভাবেই হয়। এটা কিভাবে সম্ভব হল যে হযরত ইব্রাহিম (আ.)এ র বংশে অনেক নবী জন্ম নিল?তাই এটি খোদা তা'লার ইচ্ছে, তিনি যাকে খুশি নির্বাচিত করতে পারেন। একটি ইলেক্টোরাল কালেজের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন হয় আর খোদা তা'লাই সেই সমস্ত সদস্যদের মনে এই প্রেরণার সঞ্চার করেন, তিনিই নির্বাচিত করেন। কেউ কিছু জানতে পারে না যে কে নির্বাচিত হবে।

উত্তর শুনে সেই অতিথি বলেন, আপনার মনে কি কখনও এই ধারণার উদ্রেক হয়েছিল যে আপনিও খলীফা নির্বাচিত হতে পারেন?

আমি যখন নির্বাচিত হই, তখন ইলোক্টোরাল কলেজের চেয়ারম্যানকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এর থেকে অব্যহতি পাওয়ার কি কোনও উপায় আছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচনের সময়, সম্ভবত নির্বাচনের পূর্বে জামাতের মতবিরোধ দেখা দেয়। আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে, জামাতের দুটি গোষ্ঠী আছে। একটি অত্যন্ত নগণ্য গোষ্ঠী আর অপরটি বৃহদাকারের, যারা খিলাফতে বিশ্বাসী। এই মতবিরোধ শুরু হওয়ার সময়ও দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বিরুদ্ধবাদীদেরকে বলেছিলেন, আপনারা যাকেই খলীফা নির্বাচিত করবেন, আমি তাকে গ্রহণ করব। খলীফা হওয়াই আমার আগ্রহ নেই।

এক সদস্য প্রশ্ন করেন, আপনারা কি আন্ত:ধর্মীয় সংলাপের সমর্থন করেন? যেমন আপনারা কি কখনও পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করেন? সাক্ষাত করে থাকলে তাঁর সঙ্গে কি কথা হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি কখনও পোপের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করি নি। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় খলীফা ১৯২৪ সালে একবার অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সাক্ষাত করেন নি। তিনি অজুহাত দেখান যে, যেহেতু তাঁর প্রসাদ নির্মাণাধীন রয়েছে, সেই কারণে অভ্যর্থনা জানানো সম্ভব নয়। সেই সময় ইতালিয়ান পত্রিকা এই সংবাদ প্রকাশ করেছিল যে, পোপ সাক্ষাত এড়ানোর জন্য নির্মাণাধীন প্রসাদের অজুহাত দেখালেন। পোপ যেহেতু জামাত আহমদীয়ার খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করতে ইচ্ছুক নন, এই কারণে তাঁর প্রসাদের কাজ কখনই সম্পূর্ণ হয় নি।

এক অতিথি প্রশ্ন করেন, আপনি কি অন্যান্য ধর্মের নেতাদের সঙ্গে সংলাপ করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই। আমরা তো উদার, সাক্ষাত করতে আগ্রহী। গত বছর 'গড ইন ২১ সেঞ্চুরী' নামে লন্ডনের গিল্ড হলে একটি আন্ত:ধর্মীয় সেমিনার করেছিলাম। ইজরাইল থেকে ইহুদীদের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। চার্চের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মের নেতারাও ছিলেন। দালাইলামার প্রতিনিধিও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আমিও সেখানে কথা বলেছিলাম। একই মঞ্চে সকলকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমরাই পুরো আয়োজন করেছিলাম। আমরা আগে থেকেই এই সব কিছু করছি, যাতে সকলে এক হাতে সমবেত হয় আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক সদস্য বলেন, 'যুবক সম্প্রদায়ের জন্য আপনাদের সব থেকে বড় চিন্তার বিষয় কোনটি? আপনারা তাদের জন্য কি করতে চান?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি যুবক এবং প্রত্যেক আহমদী সদস্যের জন্য এটাই চাই যে, তারা নিজেদের খোদাকে চিনুক।দুটি কথা অত্যন্ত জরুরী, যার সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যে তিনি দুটি বিষয় নিয়ে এসেছেন। যেগুলির মধ্যে একটি হল মানুষকে তাদের স্রষ্টার নিকটবর্তী করা এবং দ্বিতীয়টি মানবজাতির অধিকার প্রদানের প্রতি সচেতন করে তোলা। এই দুটি বিষয় প্রত্যেকে জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয় যে, আমাদের যুবকরাও অন্যান্য মুসলমানদের মত উগ্রবাদী, তবে এনিয়ে আমাদের কোনও ভয়ের কারণ নেই। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমরা এই ধরণের নিবুদ্ধিতাপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে মুক্ত।

এক অতিথি প্রশ্ন করেন যে, আহমদীরা কি সেই সব মুসলমান দেশগুলিতে সংখ্যালঘু খৃষ্টানদের সাহায্য করবে, যেখানে তারা নিরাপদ নয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলাম তো এটাই শিক্ষা দেয় যে, তাদেরকে রক্ষা করা উচিত। আমরা যেখানে জানতে পারি, সেখানে আমরা সাহায্য করে থাকি। রাবোয়ার ৯৮ শতাংশই আহমদী। আমরা নিজেদের জমি থেকে খৃষ্টানদেরকে গীর্জা বানানোর জন্য জমি দিয়েছি। এখনও আমরা মুসলমান দেশসমূহে এতটা শক্তি অর্জন করে ফেলি নি যার দ্বারা বলতে পারব যে প্রকৃত ইসলামী শাসন কেমন হয়ে থাকে। একটা সীমা পর্যন্ত আমরা তাদের সাহায্য করে থাকি।

এক সদস্য প্রশ্ন করেন যে, আমি আহমদীয়া জামাত নিয়ে গবেষণা করছি। বর্তমানে 'শান্তির পথ' পুস্তিকাটি অধ্যায়ন করছি। পুস্তিকাটির শেষে আপনি বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের নামে যে চিঠি লিখেছেন তা লিপিবদ্ধ আছে। আপনি সেগুলির উত্তর পেয়েছেন?

উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন উত্তর পাই নি। রাষ্ট্রপতির এক ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা আমাকে বলেছিলেন, তিনি উত্তর দেওয়ার জন্য কথা বলবেন। কিন্তু কোনও উত্তর পাই নি। তাদের একটি প্রতিষ্ঠান, সম্ভবত পেন্টাগন এর উত্তর দিতে তাঁকে নিষেধ করেছে। তারা বলেছে উত্তর দিলে সমস্যায় পড়বে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু ততটা যথাযথ উত্তর ছিল না। কেবল যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন খুব ভাল উত্তর পাঠিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল কথা লিখেছিলেন। একথা শুনে ডক্টর গাইসি বলেন, আমি আশা করি, হুযুরের দোয়া কবুল হবে আর আমরা উপরে উঠে আসব।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 28 Jan, 2021 Issue No.4

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দ্বিতীয় জানাজা হাবিবুল্লাহ মাজহার সাহেবের। তার পিতার নাম ছিল চৌধুরী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব। হাবিবুল্লাহ মাজহার সাহেব আল্লাহ্‌র পথে কারাজীবনও কাটিয়েছে। তিনি গত ২৪ অক্টোবর ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তার পিতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর হাতে বয়াত করে আহমদী হয়েছিলেন। চৌধুরী সাহেব বিভিন্ন সরকারী বিভাগে বিভিন্ন মর্যাদায় কাজ করেছেন এবং সরকারী একটি বিভাগে পরিচালক থাকাকালীন তিনি অবসরে যান। প্রায় ৫০ বছরের বেশি কাল তিনি জামাতের সেবা করেছেন। মজলিসের কায়েদ থেকে শুরু করে আনসারুল্লাহর যয়ীমসহ বিভিন্ন জামাতী পদে এবং জামাতের প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি পদে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। রসূল অবমাননা আইন-২৯৫ এর অধীনে কোন আহমদীর বিরুদ্ধে দায়ের কৃত মৃত্যদণ্ডের প্রথম মামলা হয়েছিল চৌধুরী হাবিবুল্লাহ্ মাজহার সাহেবের বিরুদ্ধে যা ১৯৯১ সালে ২৯ অক্টোবর তারিখে (লাহোরের) শাহদারা থানায় দায়ের করা হয়েছিল। তাই তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রথম আহমদী ছিলেন যাকে এই আইনের অধীনে প্রথম কারাবন্দী হিসেবে কষ্ট সহ্য করার সৌভাগ্য হয়েছিল। জেলা সেশন কোর্ট তার পক্ষে রায় দিলেও বিরোধীরা হাইকোর্টে আপিল করলে আপিল বিভাগের বিচারক জাস্টিস আব্দুল মাজিদ রসুল অবমাননার নামে দায়েরকৃত মামলায় তার জামিন বাজেয়াপ্ত করেন। এবং তাকে সাজা দেওয়ার জন্য তখন যত চেষ্টা করা সম্ভব ছিল, বিরোধীরা তা করেছে। তারা ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় লিফলেট বিতরণ করে এবং তার সম্পর্কে বাজে কথাবার্তা তারা প্রচার করে। যাহোক চৌধুরী হাবীবুল্লাহ সাহেব এই সময়েঅত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে বন্দী জীবনের কাঠিন্য সহ্য করেছেন।অতঃপর আল্লাহ তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যে, কয়েক মাসের মধ্যেই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তানদেরকে নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত মিশুক, সমব্যাথী, বিনয়ী, খেলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগী ও খেলাফতের নিষ্টাবান প্রেমিক ছিলেন। জুমু'আর খুৎবা ও বক্তৃতা নিয়মিত শুনতেন বরং ঘরের সবাইকে একত্রিত করে একথা বলতেন যে, সকল কাজ রেখে দাও এবং এখানে বসে খুৎবার সময়ে খুৎবা শুন এবং স্বয়ং উপস্থিত থেকে সবাইকে খুৎবা শোনাতেন। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে তিনি মুসী ছিলেন এবং ১/৯ ভাগ ওসীয়্যত করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তার সহধর্মিণী রুকাইয়্যা বেগম ছাড়াও পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। তার এক ছেলে হাসিব আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ এবং ফযলে উমর ফাউন্ডেশনে ইংরেজী বিভাগে কাজ করছেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের সঙ্গে কৃপা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরকেও তার সৎকর্মের ধারা অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

পরবতী জানাযা জনাব বশিরুদ্দীন আহমদ সাহেবের। খলিফা বশিরুদ্দীন আহমদ গত ৩০ নভেম্বর ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

ভারতের ফিরোজপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খলিফা তাক্বিউদ্দীন সাহেবের পুত্র এবং হযরত ডাক্তার খলিফা রশিদ উদ্দীন সাহেবের পৌত্র ছিলেন। ডাক্তার খলিফা রশিদ উদ্দীন সাহেব খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর প্রথম সহধর্মিণী উম্মে নাসেরের পিতা ছিলেন। হযরত খলীফা রশিদুদ্দীন সাহেবের মালী কুরবানীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যাই হোক তিনি তার বংশধর ছিলেন। জামাতী কাজেও অংশ নিতেন। অ -আহমদীদেরকে নিজ ঘরে ডেকে তবলীগ করতেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেছেন। ১৯৯৮ সনে সুইডেন চলে যান । ১৯৯৯ সনে সেখানে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপর তিনি সুস্থ হয়ে পুনঃরায় মসজিদের কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। সেক্রেটারী তবলীগও ছিলেন । প্রতিবছর স্বীয় স্ত্রী সন্তানদের সাথে এখানে অর্থাৎ ইউকে'র জলসায় যোগদান করতেন। তিনি তার স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। তার স্ত্রী একজন ইংরেজ ছিলেন যিনি খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে আহমদী হয়েছিলেন কিন্তু খুব শালীন পোষাক পরতেন এবং পর্দা করতেন। খুবই সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। তার ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের খুব আগ্রহ রয়েছে এবং সেগুলোর ওপর আমল করারও পূর্ণ চেষ্টা করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ঈমান ও বিশ্বাসেও উন্নতি দান করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফীক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি কৃপা ও দয়ার আচরন করুন।

পরবর্তী জানাযা মোহতরমা আমিনা আহমদ সাহেবার যিনি খলীফা রফিউদ্দীন আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন।তিনি ১৯ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তিনি গায়ানার অধিবাসী ছিলেন।

তিনি ১৯৪০ সনে গায়ানার বিখ্যাত মুসলিম ব্যব সায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার শিক্ষাজীবনে লন্ডনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তখনই তার বিবাহ আর ডি আহমদ সাহেব মরহুমের সাথে হয় যিনি ডাক্তার খলিফা তকিউদ্দিনের সন্তান ছিলেন। তিনি হযরত খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেবের বংশধর ছিলেন। মরহুমা খুবই সহানুভূতিশীলা, লোকদের প্রতি যত্নবান ও অতিথিপরায়ন নারী ছিলেন। নামাযে নিয়মিত ছিলেন। সর্বদা তার নামাযের চিন্তা থাকত। শরীর ভাল না থাকা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। শারিরিক অসু স্থতা ও ক্যান্সার থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যের প্রায় প্রতিটি জলসায় শরিক হতেন। দোয়ার ওপর খুব জোর ছিল। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। সর্বদা যখনই আমার সাথে সাক্ষাত করতেন বিশেষভাবে খুব বিনয়ের সাথে সাক্ষাত করতেন। দোয়ার অনুরোধ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমাসুন্দর ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন এবং তার সন্তানদেরও জামাতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফীক দান করুন।

(১ম পাতার শেষাংশ.....)

ত্যাগ করে কিছু নতুন বিষয় অবলম্বন কর। এমন মানুষদের জন্য সব সময় একথা বিস্ময়ের হয়ে থাকে যে, রসূল বলছে বর্তমান ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থাপনা অবলম্বন কর। কাফেরদের এই দুটি কথার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। একদিকে তো তাদের মধ্যে এতটা হতাশা রয়েছে যে, তারা মনে করে, তাদের চিকিৎসার জন্য তাদের মধ্য থেকে কেউ আসতে পারেনা। অপরদিকে তারা এনিয়ে লড়াই করে যে, তাদের ব্যবস্থাপনা কেন বদলে দিচ্ছ? অধঃপতিত জাতির এমনই দশা হয়ে থাকে। তারা চায় যেন কিছু ত্যাগ করতে হয় আর না কিছু কাজ করতে হয়। এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে তাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। এরজন্য তাদেরকে শিক্ষা অর্জনও করতে হবে না, পরিশ্রমও করতে হবে না কিম্বা কোনও মন্দ কর্ম ত্যাগ করতে হবে না। বরং এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে অন্যদেরকে মেরে ফেলবে আর সব কিছু তাদের হয়ে যাবে। তারা চিন্তা করে দেখে না যে, যদি পূর্বের ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকত, তবে লাঞ্ছনা ও পশ্চাদপদতায় কেনই বা পড়ে থাকত? অতএব তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে দিয়েই পরিবর্তন সম্ভব।

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir